অমিয়কুমার ঘটক

নিজের পায়ে নিজের পথে

ঋত্বিককুমার ঘটক

নিজের পায়ে নিজের পথে

ঋত্বিককুমার ঘটক

নিজের পায়ে নিজের পথে

এক কথা-কোলাজ

সংকলন-বিন্যাস। সন্দীপন ভট্টাচার্য

প্রথম প্রকাশ। কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসব, নভেম্বর ২০১০

প্রকাশক। সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা
২ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৩
ফোন (০৩৩) ২২২৮ ৭৯১১
ওয়েবসাইট। www.cinecentralcalcutta.org
ই-মেল। cinecentral@hotmail.com/ cine1965@gmail.com

এবং মনফকিরা
২২৮৩ নয়াবাদ, বাড়ি ৮ রাস্তা ১, নবোদিত, মুকুন্দপুর, কলকাতা ৭০০ ০৯৯
বইপাড়ায় ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
ফোন (০৩৩) ২৪২৬০৯২৮/ ৯৪৩৩৪১২৬৮২/ ৯৪৩৩১২৮৫৫৫
ওয়েবসাইট। www.monfakira.com
ব্লগস্পট। http://monfakira.blogspot.com
ই-মেল। monfakirabooks@gmail.com/ monfakira.pub@gmail.com
monfakirabooks@yahoo.co.in

মুদ্রণ। জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড,
কলকাতা ৭০০ ০০৯, ফোন (০৩৩) ২৩৫১ ৪৩৭৮

১০০ টাকা

ঋত্বিক ঘটকের মুখের কথাকে পনেরোটি সাক্ষাৎকারের বয়ান থেকে ভেঙে, সাজিয়ে নির্মিত এই কথা-কোলাজ। এক-একটা বিষয়ের ঘেরে, তাঁর জীবনের অনুক্রম বজায় রেখে এই কোলাজ-এ রয়েছে শুধু তাঁরই মুখের কথা, বা বলা যায়, তাঁর কথামৃত, বা আরও সঠিক ভাবে বিষ-কথা।

এখানে অবশ্য তাঁর জীবনের সব তথ্য, ঘটনা বা অনুভবের সন্ধান করলে তা পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে শুধু সেইটুকুই, যা মুখে-মুখে এই সমস্ত সাক্ষাৎকারে তিনি একদা বলেছিলেন। যেমন, এখানে 'নাগরিক' ও 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা থাকলেও, 'অযান্ত্রিক', 'সুবর্ণরেখা', 'কোমল গান্ধার' বা 'মেঘে ঢাকা তারা' সম্পর্কে তেমন কিছুই নেই। আবার, 'তিতাস একটি নদীর নাম' বা 'যুক্তি তক্কো' নিয়ে অনেক কথা আছে। এই রকম সব ফাঁক ভরাট করার জন্য অতএব পাঠককে সাহায্য নিতে হবে ঋত্বিকেরই অন্যান্য রচনার, এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে তাঁর অন্য লেখাও। সৌভাগ্যের কথা যে, তার পরিমাণও কিছু কম নয়, আর মূল্য অপরিসীম।

এই কথা-কোলাজে শুধু বাংলায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের বয়ানই আমরা গ্রহণ করেছি। এই সমস্ত সাক্ষাৎকার একদা প্রকাশিত হয়েছিল চলচ্চিত্র (৩ বর্ষ, আশ্বিন ১৩৬৯), চলচ্চিত্র (আশ্বিন ১৩৭২), মুভি মনতাজ (সাক্ষাৎকার সুনীত সেনগুপ্ত, ১ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৯৬৭), ধ্বনি (৩ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, সাক্ষাৎকার জগৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯), অভিনয় (সা. অজয় বসু, মে ১৯৭০), আন্তর্জাতিক আঙ্গিক (সা. অজয় বসু, ১৩৭৯-৮০), চিত্রভাষ (জুলাই ১৯৭০), চিত্রপট (সা. টুলু দাশ, সংখ্যা ১০, ১৯৭৩), চিত্রবীক্ষণ (অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৩), চিত্রবীক্ষণ (সা. সাধন চক্রবর্তী, দীপক দে ও অন্যান্য, অগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭৪), ধ্রুপদী (সা. মহম্মদ খসরু, এপ্রিল ১৯৭৭), জালিম সিংয়ের জার্নাল (সা. প্রবীর সেন, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬-এপ্রিল ১৯৭৭), স্বরবর্ণ (সা. বাসব দাশগুপ্ত, ১৯৭৬), এফ (সা. বিজয় সোনি ও নেত্র সিং রাওয়াত, অনুবাদ সোমেন ঘোষ, মার্চ ১৯৮৬) এবং শারদীয় অমৃত (সাক্ষাৎকার সত্যব্রত দে, ১৩৭৪) পত্রিকায়।

ঋত্বিকের আঠারোটি অগ্রন্থিত সাক্ষাৎকার (এর মধ্যে তিনটি ছিল মূল ইংরেজিতে) ও ঋত্বিককে কেন্দ্র করে একুশ জনের অগ্রন্থিত লেখা নিয়ে প্রায় বছর-দশেক আগে প্রকাশিত হয়েছিল 'সাক্ষাৎ ঋত্বিক' (দীপায়ন, ২০০০)। সে

বই এখন আর পাওয়া যায় না। তার মধ্যে থেকে শুধু সাক্ষাৎকারগুলি নিয়ে পরে এর একটি ইংরাজি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল, সে বইও অনেক কাল নিঃশেষিত। তবু সে সবের নিছক পুনরাবৃত্তি না-করে এ বই প্রকাশিত হচ্ছে এক ভিন্ন বয়ানে।

একদা যাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এ সমস্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় যাঁরা তা প্রকাশ করেছিলেন— তাঁদের সকলের উদ্দেশেই এই কথা-কোলাজ নিবেদিত হল।

ঋত্বিক মেমোরিয়াল লাইব্রেরি, নাট্যশোধ সংস্থান এবং লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির সূত্রে হারিয়ে-যাওয়া কয়েকটি সাক্ষাৎকার একদা উদ্ধার করা হয়েছিল, কৃতজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে।

প্রকৃতপক্ষে ঋত্বিক আমাদের গুরু। গুরুবাক্য শ্রবণ, স্মরণ ও ধারণ করা আমাদের কর্তব্য। সেই কর্তব্যবোধেই বার-বার এই কাজ, এই কথা-কোলাজ।

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ও মনফকিরা
কলকাতা চলচ্চিত্রোৎসব, নভেম্বর ২০১০

নিজের পায়ে নিজের পথে

বাবা যখন ঢাকায় D.M. ছিলেন, সেই সময়েই আমি পৃথিবীর প্রথম সূর্যোদয় দেখি। পিতৃদেব, রায়বাহাদুর সুরেশচন্দ্র ঘটকের তখন খুব রবরবা। বাল্যের প্রভাব আমার জীবনে এসেছে এবং ভীষণ ভাবেই এসেছে। এসেছে যে, তা আমার শিল্পকর্মই বলবে। যদিও খুব শৈশবে আমায় চলে আসতে হয়েছিল, কিন্তু আজও পূর্ব বাংলার স্মৃতি ভুলে উঠতে পারিনি। উদার উন্মুক্ত মাঠ, ধানের ক্ষেত, নীল আকাশ এবং সবচেয়ে বড়— পদ্মা নদী, এ সবের চিন্তা আমাকে এখনও আচ্ছন্ন করে রাখে। আমার সমস্ত বাংলাকে ভালোবাসার মূল হচ্ছে পূর্ব বাংলা। পরে নিজেদের ষোলো আনা সুবিধের জন্যে জোচ্চুরি দ্বারা যে দেশভাগ করা হল, তার ফলে আমার মতো প্রচুর বাঙালি শিকড় হারিয়েছে। এ দুঃখ ভোলার নয়। আমার শিল্প তারই ভিত্তিতে।

আমার প্রথম পাঠ ময়মনসিংহের মিশন স্কুলে। তারপর কলকাতার বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে (এখানে Class III থেকে) Matric pass করি। পরে রাজশাহি কলেজে Science-এ ভর্তি হই। Science-এ ঢুকে ভুল হল। ছেড়ে Arts নিলাম। এবং তারপর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে BA pass করি। এখানেও সেই দৈবক্রম— ইংরেজি honours-এ first class পেয়ে গেলুম। শুরু করলাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে MA পড়তে। কিন্তু final পরীক্ষার ঠিক আগেই পড়া ছেড়ে দিলুম। Communist Party-তে ঢোকার জন্যে। Party line-এর কাজ, পড়ায় ইস্তফা দিলুম।

আগে আমি লিখতাম, অর্থাৎ সাহিত্য করতাম। দেখলাম এই গল্প, কবিতা মানুষকে সোজাসুজি affect করে না। বড় remote. সেই জন্যে গেলাম নাটক করতে— stage-এ। সামনে এক হাজার, দু-হাজার, পাঁচ হাজার লোক পাব, তাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পারব। Immediate reaction হবে। পরে দেখলাম Cinema আরও শক্তিশালী মাধ্যম, আরও বেশি লোককে একসাথে hit করতে পারব। আমি যা বলতে চাই, তার একটা immediacy আছে, তাগিদ আছে, তাড়া আছে। সিনেমা এ দিক থেকে সবচেয়ে আদর্শ মাধ্যম।

প্রথমে কবিতা লিখতাম। তারপর গল্প-উপন্যাসের জগতে এলাম। কিন্তু চারপাশের বদমাইশির বিরুদ্ধে অনেক চিৎকার আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত ছিল। তখন ভাবলাম নাটকের মাধ্যমে মানুষের সামনে ঘটনাগুলি সোজা-সুজি পৌঁছে দেওয়া যাবে। তাই নাটক নিয়ে পড়লাম। তারপর দেখলাম যে নাটক অত্যন্ত সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে ঘোরে। তখন মনে এল সিনেমার কথা। আমার সিনেমায় আসার একমাত্র কারণ হচ্ছে নিজস্ব উপলব্ধিগুলি আরও সোচ্চারে বলে যাওয়া। এর বেশি কিছু নেই।

আমি যখন First year class-এ পড়তাম, তখন একটু RSP-র দিকে ঝুঁকে পড়েছিলাম। তারপরে IPTA-র influence আমার ওপর এসে পড়ল। আমি ঐ দিক থেকে সরে এসে সম্পূর্ণ Marxist পড়াশোনা আরম্ভ করলাম। Marxism-এর বইপত্র পড়া, লেখা এবং অভিনয় করা, এই সমস্তগুলোই করতাম সেই সময়। এই '৪৪ সাল-টাল হবে। ঐ রকম আর কী। Exact date-টা আমি বলতে পারব না। তখন থেকেই আমি গণনাট্যে আছি। ছিলাম। (Secretary) আমি হলাম '48-এ। '48-এ হলাম, '53-তে আমি ছেড়ে দিলাম।. . . Party banned হবার একটু আগে।

(গণনাট্যে থাকাকালীন আমার নাটকের) সব ক'টাতেই পরিচালক আমি ছিলাম। আমার নাটকের মধ্যে তখন 'জ্বালা', 'দলিল'— 'দলিল'টা প্রথম— 'অফিসার', 'ভাঙা বন্দর' এই চারটেই আমার মনে পড়ছে. . . 'সাঁকো'। আরও কিছু-কিছু আছে, আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

'দলিল'? ১৯৪৮-এ আমি রাজশাহি থেকে কলকাতায় এলাম। থাকগে, সে নানা রকম কথা। কথা হচ্ছে যে, সংক্ষেপে, মা-কে নিয়ে আমায় আসতে হল। তখন চোখের সামনে দেখে. . . এ 'বাস্তুহারা' এই ব্যাপারটাই, এই ভাষাটাই প্রথমত আমার অসহ্য লাগে। এই 'শরণার্থী', 'বাস্তুহারা', এ সব কথা শুনলে গা ঘিনঘিন করে। হ্যাঁ, most. . . affair. থাকগে। 'দলিল' আমি লিখলাম, তখন আমি IPTA-র secretary ছিলাম। এবং Central Squad-এর director ছিলাম। নাটক করাই তখন আমার কাজ ছিল। করা গেল। ওটা All India-র first prize পেল। আমি তখন acting-ও করতাম, ইত্যাদি। তার পরে পি.সি. যোশি আমাকে— তখন পি.সি. যোশি এলাহাবাদে— একটা চিঠি লিখল। আমার সেজদার বাড়িতে আমি তখন থাকতাম। সেটা হচ্ছে ঐ হরিশ মুখুজ্যে রোডে। তখন 1951. তখন ঐ 'Indian Way' বলে একটা কাগজ বেরত। Editor ছিলেন পি.সি. যোশি। যোশি, আপনারা জানেন, General Secretary ছিলেন তার আগে। তারপর মাঝখানে বি.টি.আর এল, রনদিভে,

যার ফলে আমাদের, আমার ও বৌয়ের বারোটা বাজল। Anyway. . . damn it. সে সব আলোচনা করে কোন লাভ নেই। এখনকার ছেলেপুলেরা জানবেও না, বুঝবেও না। কাজেই ঐ সমস্ত কথার কোন দরকার নেই। পি.সি. কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি, আমাকে সে বলল, 'You take over the charge of Bengal.' Correspondent আর কী। সে সময় আমি ৩১টা suicide. . . মানে, as a correspondent, as a journalist, আমাকে এই সমস্তগুলো cover করতে হল। তো, ৩১টা suicide দেখে, তার ওপরে আমি 'Suicide Wave in Calcutta' বলে (লেখা) পাঠালাম। সেটা বেরল এবং খুব নামধাম (হল)। তা আমি ভাবলাম এতে তো জমবে না মাল! আরও রাগ প্রকাশ করার একটা ব্যাপার আছে। তখন আমি film-এ encroach করিনি at all. এই 'জ্বালা' নাটকে তার থেকে select করে ছ'টা চরিত্র— each one is a true character. 'জ্বালা' is a documentary. এই নাটক লিখলাম এবং acting করলাম। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কাজ করলাম। তারপরে এখন বিভিন্ন জায়গায় privilege দিল। কিন্তু সেই সময়কার কলকাতা. . .। এই যে এখন আরও horrible, মানে এখন তো একটা বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। At that time it was more or less a much better city.

('জ্বালা'তে আমার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন) কালী বাঁড়ুজ্যে, গীতা দে, মমতাজ, ঐ একটা মমতা (চট্টোপাধ্যায়) বলে মেয়ে ছিল, সে. . . আর-একটা বাচ্চাকে নিয়েছিলাম। এই, . . জ্ঞানেশ ইত্যাদি।

বিজনবাবু ছিলেন না। সে '৫১ সালের কথা বাবা— '৫১-'৫২ সালের কাজ। তারপরে আমি নাবিওনি কিছুতে। তার পরে আমাকে বহু দিন পরে টাইনি চ্যাটার্জি— এখন যে Director General, Radio, সে তখন এখানে director ছিল— সে আমাকে ধরে। 'জ্বালা'টা আমি direct করে দিয়েছি খালি, আমি নাবিনি। মানে, গলা দিইনি।

তার পরে আমার ভাইপো ফল্গু, সে পাটনায় এটা (করে) হিন্দিতে। ফণীশ্বর রেণু, এই যে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' পেয়েছে, সে হিন্দিতে অনুবাদ করে। তার বৌটা আবার বাঙালি। এ ছোঁড়াও মুঙ্গেরের, তার মানে পুরো বাঙালি। বাংলা জানে। আমার ভাইপো আর ফণীশ্বর পাশাপাশি থাকে। এদের একটা theatre group আছে। এটা অনুবাদ করে পাটনা Radio থেকে আবার (প্রচার) করে থাকে। তারপর দিল্লি Radio থেকেও হল। ছেড়ে দাও। এখন তো এটা acceptable. তখন it was not taken in. গ্রহণ করার পক্ষে, was very difficult. কিন্তু এখন things have become much more. . .

আমার ছবির জগতে আসার অনেকগুলি কার্যকারণ সম্পর্ক ছিল। আমার এক দাদা, মেজ ভাই, মারা গেছেন, এ দেশে প্রথম television expert. মেজদা গ্রেট ব্রিটেনে documentary cameraman হিশেবে ছ'বছর কাজ করে দেশে ফিরে আসেন 1935-এ, '36-এ তিনি join করেন New Theatres-এ। সায়গল-কাননবালার 'Street Singer' ছবিতে তিনি camera-man ছিলেন, এ ধরনের অনেক ছবিতেই তিনি কাজ করেছেন।

মেজদার সুবাদে ছোটবেলা থেকেই দেখেছি বড়ুয়াসাহেব থেকে শুরু করে বিমল রায় অবধি অনেককেই। তাঁরা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। কাজেই আমাদের বাড়িতে সেই যুগের film-এর একটা আব-হাওয়া বা পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। আর সকলেই যে-রকম ছবি দেখে, সে রকম আমিও এঁদের ছবি দেখতাম। আমার একটা বিশেষ উৎসাহ ছিল, কেননা এঁদের আমি দেখতাম দাদার সঙ্গে আড্ডা মারতে। কাজেই পরিবেশ মোটামুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

ছবির জগতে আসব, এ কথা অবশ্য তখনও ভাবিনি। নানা রকম করেছি, বাড়ি থেকে দু-তিন বার পালিয়েছি। কানপুরের একটা Textile mill-এ কাজ করেছি Bill department-এ। সিনেমাটা মাথায় ঢোকেনি তখনও। বাড়ি থেকে জোর করে ধরে নিয়ে এল কানপুর থেকে, সেটা 'বেয়াল্লিশ সাল। মাঝখানে দু-বছর পড়াশোনা 'gone'। বাড়ি থেকে যখন পালিয়েছিলাম, তখন আমার বয়স চোদ্দ।

বাবা বলেছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিলে engineer-ফেঞ্জিনিয়র হওয়া যায়, নইলে নাকি মিস্তিরি হয়ে থাকতে হবে। হঠাৎ পড়াশোনায় মন এসে গেল এবং তারপর পড়াশোনার দিকেই মন থাকল। এবং বাঙালি ছেলেদের যা বাঁধা এবং ফরাসিদেরও যা হয় শুনেছি যে, ভেতরে একটা creative urge দেখা দিলেই প্রথমে কবিতা বেরোয়। তা দু'চারটে অতি হতভাগা লেখা দিয়ে আমার শিল্পচর্চা শুরু হল। তার পরে আমি দেখলাম ওটা আমার হবে না। কাব্যির এক লক্ষ মাইলের মধ্যে আমি কোন দিন যেতে পারব না।

তারপরে হল কী, রাজনীতিতে ঢুকে পড়লাম। '৪৩-'৪৪-'৪৫, সে সময়কার কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা জানেন যে সে সময়টা ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত পটপরিবর্তনের সময়।

ফ্যাসিবিরোধী ব্যাপারটা হবার সঙ্গে-সঙ্গে জাপানি আক্রমণ, ব্রিটিশদের পালানো, এখানে সেই যুদ্ধ-বোমা-টোমা, হ্যানাত্যানা— মানে very quickly in succession, কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। Placid, শান্ত-নিস্তরঙ্গ জীবন ছিল '৪০-'৪১, হঠাৎ '৪৪-'৪৫ সালে পর-পর কতকগুলো ঘটনা ঘটে গেল।

চালের দর চড়ে গেল, দুর্ভিক্ষ. . . famine, পর-পর কতকগুলো changes সমস্ত মানুষের চিন্তাধারাকে একটা বিরাট ধাক্কা দিল। আমি তখন. . .

আমি তখন মার্কসবাদী রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েছি, ঝুঁকে পড়েছি শুধু নয়, active কর্মী, card-holder ছিলাম না অবশ্য, কিন্তু close sympathizer, fellow traveller আর কী।

সেই সময় গল্প লিখতে আরম্ভ করলাম। গল্প লেখার urge-টা কিন্তু সেই কবিতা লেখার মতো ভুয়ো, ধোঁয়াটে ব্যাপার ছিল না। চারপাশে যে-সমস্ত খারাপ বদমায়েশি, অত্যাচার ইত্যাদি দেখছি, তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জীব হিশেবে সোচ্চার প্রতিবাদ করার ইচ্ছে থেকেই গল্প লেখার urge এসেছিল সেই ছোট বয়সেই। গল্প আমি খুব খারাপ লিখতাম না। আমার এখনও মনে আছে আমার আর সমরেশের প্রথম ছাপা গল্প বেরোয় 'অগ্রণী'তে, তারপর সজনীবাবুর 'শনিবারের চিঠি', 'গল্পভারতী'— নৃপেন্দ্রকৃষ্ণবাবু তখন editor, 'দেশ'— সব মিলিয়ে আমার গোটা-পঞ্চাশ গল্প বেরিয়েছিল।

এর মধ্যে একটা magazine-ও বের করেছিলাম, Marxism ঘেঁষা। ঐ মফস্বল শহর থেকে। আমি তখন রাজশাহি শহরে 3rd year-এ পড়ছি। মফস্বল শহরে ছাপা magazine তখন খুব দুষ্প্রাপ্য ব্যাপার। বেশ কয়েক মাস চলেওছিল কাগজটা, সবই নিজেদের ট্যাকের পয়সা থেকে, অবশ্যই উঠে গিয়েছিল যথারীতি। তার পর মনে হল গল্পটা inadequate, ভাবলাম গল্প ক'জন লোককে নাড়া দেয় আর নাড়া দেয় অনেক গভীরে গিয়ে, কাজেই অনেক সময় লাগে পৌঁছতে। আমার তখন টগবগে রক্ত, immediate reaction চাই। সেই সময়ে হল 'নবান্ন'। 'নবান্ন' আমার সমস্ত জীবনধারা পালটে দিল।

গণনাট্য সংঘে তখনও join করিনি। তবে আশেপাশে ঘুরছি। প্রত্যেকেই আমার চেনা, শম্ভুদা, বিজনবাবু, সুধীবাবু, দিগিনবাবু, গঙ্গাদা, গোপাল হালদার মশায়, মানিকবাবু, তারাশঙ্করদা। গণনাট্য সংঘ তখন আলাদা ছিল না, Progressive Writers' Assotiation-এর একটা অংশ ছিল। তারাশঙ্করদা ছিলেন PWA-র President, এঁদের সকলের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। আমার বড়দা কল্লোল যুগের একজন নাম-করা কবি ছিলেন, যুবনাশ্ব, মনীশ ঘটক, সেই সুবাদে সাহিত্যিক মহলের সঙ্গেও আমাদের পরিবারের একটা যোগাযোগ ছিল। কাজেই সিনেমার লোকজনদের যেমন চিনতাম, তেমনি চিনতাম এঁদেরও।

আর এঁদের মধ্যে থেকে হঠাৎ এই 'নবান্ন'— আমার কাছে, হঠাৎই লেগেছিল। পরে জেনেছি প্রথমে বিজনবাবুর 'আগুন', পরে সেটাকে বাড়িয়ে

'জবানবন্দী' একাঙ্কিকা, 'জবানবন্দী'র success-এর পর সেটাকে বাড়িয়ে পূর্ণ নাটক— 'নবান্ন'। 'নবান্ন' আমার সমস্ত চিন্তাধারা পালটে দিল, আমি নাটকের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। IPTA-র member হয়ে গেলাম। তারপর 'নবান্ন'ই যখন আবার revised হল '৪৭-এর শেষের দিকে, তখন তাতে আমি অভিনয়ও করেছি। তার পর আমি পুরোপুরি গণনাট্যতে, Central Squad-এর leader-ও ছিলাম, নাট্যকার হিশেবে তখন নাটকও লিখেছি।

নাটক immediate reaction তৈরি করে বলে দারুণ লাগছিল, কিন্তু কিছু দিন পরে সেটাও মনে হল inadequate, মনে হল এটাও সীমিত। ব্যাপারটা হচ্ছে চার-পাঁচ হাজার লোক, আমরা যখন মাঠে-ময়দানে নাটক করতাম তখন চার-পাঁচ হাজার লোক জমা হত, নাটক করে তাঁদের একসঙ্গে rouse করা যেত।

তখন মনে হল সিনেমার কথা, সিনেমা লাখ-লাখ লোককে একসঙ্গে একেবারে complete মোচড় দিতে পারে। এই ভাবে আমি সিনেমাতে এসেছি, সিনেমা করব বলে আসিনি। কাল যদি সিনেমার চেয়ে better medium বেরোয়, তা হলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি চলে যাব। I don't love film.

মাধ্যমটা কোন প্রশ্নই না। আমার কাছে মাধ্যমের কোন মূল্য নেই। আমার কাছে বক্তব্যের মূল্য আছে। আমি কেন এ সমস্ত মাধ্যম change করেছি, বদলেছি? কারণ বক্তব্যটা মানবদরদি। বক্তব্য বলার চেষ্টা বা পৃথিবী সম্বন্ধে জানা বা মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি মমত্ববোধের প্রশ্নটাই প্রথম কথা, সিনেমার প্রতি মমত্ববোধটা কোন কাজের কথাই না, ও সমস্ত যারা aesthete, তারা করুন গিয়ে। Arts for art's sake যারা, তারা করুন গিয়ে। All art expressions should be geared towards the betterment of man— for man. আমি গল্প লিখছিলাম, তখন দেখলাম গল্পেতে কাজ হচ্ছে না। ক'টা লোক পড়ছে? নাটকে immediate hit— আরও বেশি লোককে convert করা যায়। I am out to convert. তারপর দেখলাম নাটকের থেকেও ভালো কাজ হচ্ছে সিনেমায়, অনেক বেশি লোককে approach করা এবং convert করা যায় এতে। So cinema is important. Cinema as such, এমন কোন value নেই। I don't think it has any value. এবং যারা এ সমস্ত কথা বলে তারা সিনেমাকে ভালোবাসে না, নিজেকে ভালোবাসে। এ জন্যই কাল যদি একটা better medium বেরোয়, তা হলে আমি সিনেমা ছেড়ে দিয়ে চলে যাব। এখন পর্যন্ত আর medium কোথায়? আমাদের দেশে এখন

পর্যন্ত জনতার কাছে পৌঁছতে পারে এমন medium হচ্ছে সিনেমা, কালকে TV হতে পারে। এখন পর্যন্ত India-তে সিনেমাই সবচেয়ে বেশি লোককে at the same time reach করতে পারে। কাজেই আমার বক্তব্যের হাতিয়ার হিশেবে একেই বেছে নিয়েছি।

রাজনীতি জীবনের একটা বিরাটতম অংশ, রাজনীতি ছাড়া কিছুই হয় না, প্রত্যেকেই রাজনীতি করে, যে করে না বলে, সে-ও করে। Apolitical বলে কোন কথা নেই। You are always a partisan, for or against. কাজেই ও-সব কথা ছেড়ে দিন, ও-সব বললে অন্য তর্কে চলে যেতে হবে।

তখনও ভেবেছি, এখনও ভাবি রাজনীতির সঙ্গে-সঙ্গে দর্শন, ভারতীয় ঐতিহ্য সমস্ত কিছুকে নিয়ে। কারণ নতুন ছবির ব্যাপারে ভারতীয় প্রাচীন জীবনটাকে, ভারতের যে-বিরাট ব্যাপারটা, তাকে ভীষণ ভাবে neglect করা হচ্ছে, অর্থাৎ এ সব নিয়ে পড়াশোনা করাটা যেন progressivism নয়। আমি মোটামুটি এ সব নিয়েই করে যাচ্ছি এবং যাব, যতদিন বেঁচে থাকব।

ছবি as such, cinema as such, film as film পেটের ভাত দেয়, সোজা বাংলা কথা। ছবি লোকে দেখে। ছবি দেখানোর সুযোগের পথ যত দিন খোলা থাকবে, তত দিন আমি পেটের ভাতের জন্য ছবি করে যাব। কালকে বা দশ বছর পরে যদি সিনেমার চেয়ে ভালো কোন medium বেরোয় আর দশ বছর আমি যদি বেঁচে থাকি, তা হলে সিনেমাকে লাথি মেরে আমি সেখানে চলে যাব। সিনেমার প্রেমে, মশায়, আমি পড়িনি।

১৯৪৯-৫০ সালে তারাশঙ্করবাবুর কাহিনী অবলম্বনে 'বেদেনি' নামে একটি ছবি তৈরিতে অগ্রসর হয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেটাকে শেষ অবধি নিয়ে যেতে পারিনি। তারপর আমার নিজের টাকায় 'নাগরিক' ছবিটি সম্পূর্ণ করি। সেটা ছিল ১৯৫০ সাল। কিন্তু ব্যবসায়িক গণ্ডগোলে সে-ছবি মুক্তি পায়নি। ১৯৫৫ সালে বিহার সরকারের জন্যে তিনটি documentary আমি করেছিলাম এবং সেগুলির মধ্যে ওরাওঁ-দের ওপরে documentary-টি ফিলিপিনস-এ প্রথম পুরস্কার পায়। এ খবরগুলি অনেকেরই জানা নেই। যা-ই হোক, এর পর কয়েক বছর অবক্ষয়ের পর আমি 'অযান্ত্রিক' তুলি এবং সেটি আমার প্রথম ছবি হিশেবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।

'নাগরিকে'র চিত্রনাট্য ১৯৫০-৫১ সালের রচনা, এর চলচ্চিত্রায়ণ সমাপ্ত হয় ১৯৫৩ সালের গোড়ার দিকে। তখনকার দিনে বাংলাদেশে বাস্তববাদী ছবি

মোটেই হত না। সে দিক থেকে একটা ভালো বিষয় নিয়ে ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলাম। চলচ্চিত্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণার এটিই প্রথম বস্তুনিষ্ঠ শিল্পরূপ। 'এক টুকরো নিশ্চিন্ততা'র সন্ধানে এক দৃঢ়প্রত্যয় নাগরিকের জীবনপথ-পরিক্রমা এর বিষয়বস্তু।

Technique-এর দিক থেকে ছবিটি মোটেই উচ্চাঙ্গের নয়। বরং হয়তো আজকের পরিণত দর্শকের কাছে এর কিছু-কিছু বিষয় খুবই খারাপ লাগবে। যেমন এর sound track বা make up খুবই জঘন্য, তবে বক্তব্যবিষয় আমার কাছে এখনও valid.

একটি ছেলে স্বপ্ন দেখত যে সে খুব বড় হবে। একটার পর একটা চাকরিতে interview দিতে যায় এবং হতাশ হয়ে ফিরে আসে। তাতে তার আশা নিভে যায় না, সাময়িক ভাবে দমে গেলেও আবার তা জেগে ওঠে। তার মনে হয়, around the corner the lucky good turn is waiting. কিন্তু ক্রমশ সে উপলব্ধি করল there is no good turn to wait for him.

কেননা আমাদের এই সামাজিক কাঠামোতে তা হওয়া সম্ভবপর নয়, আমরা যারা মধ্যবিত্ত তারা চিরকালই অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পর্যায়ে থেকে যাব, কোন দিনও ওপরে উঠতে পারব না। এই উপলব্ধিতেই গল্প শেষ।

এখানে ছেলেটির সাথে একটি মেয়ের প্রেম দেখানো হয়েছে, তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক বছরের পর বছর চলছে অথচ কোন সুপরিণতি লাভ করছে না, পরে তারা দু'জন দু'জনের প্রতি বিষ ছুঁড়তে আরম্ভ করল— এটাই স্বাভাবিক, সাত-আট বছর কেটে গেছে, অথচ ছেলেটির বিয়ে করার মুরোদ নেই। কোনখানে কোন রকম কর্মসংস্থান না-হলে তো আর বিয়ে করা যায় না, অথচ এরই মধ্যে বেঁচে থাকতে হবে, হয়তো দুটো হাতের জায়গায় চারটে হাত হলে আরও বেশি খাটা যাবে, আরও বল পাওয়া যাবে— এই ভেবে ছেলেটি মেয়েটিকে গ্রহণ করল। এই কাহিনীর এই কাঠামোতে আমি তখনকার বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের ক্ষয়িষ্ণু রূপ বর্ণনা করেছিলাম, সেই বক্তব্য আমার কাছে এখনও valid.

'নাগরিকে'র কথা তুলে লাভ নেই। 'নাগরিক' মোটামুটি একটা cooperative venture ছিল, কেউ পয়সাকড়ি নেয়নি, laboratory নেয়নি, studio নেয়নি, এমনকী raw film stock, যেটা পাওয়া যায় না, সেটাও আমি বিনে পয়সায় পেয়েছিলাম। এ সব ছাড়া যে সামান্য পয়সা লাগে তা আমরা নিজেদের ট্যাক থেকে জড়ো করে করেছিলাম ছবিটা।

কিন্তু আমরা এমন বোকা ছিলাম যে ছবির শেষ পর্যায়ে গিয়ে ব্যবসাগত ব্যাপারে একটা বাজে লোকের পাল্লায় পড়লাম আর সমস্ত জিনিশটাই নষ্ট হয়ে গেল। আমাদের মন ভেঙে গেল, বুক ভেঙে গেল। ও ছবি কোন দিনই release হবার সম্ভাবনা নেই দেখে আমরা ধরেই নিলাম যে লোকে আর ও-ছবি দেখতে পাবে না।

ছবি complete. censored. এ একটা tragedy, এ এক ইতিহাস, এর স্তরে-স্তরে বহু অধ্যায় আছে। ও-সব কথা থাক, মোটামুটি কথা হচ্ছে বেশ ভালো জুতো খাওয়া দিয়ে আরম্ভ হল আমার career-টা। ভালো মার খাওয়া দিয়ে আরম্ভ, পেটে ভালো পড়েছিল, পিঠেও পড়েছিল, বাবা মারা যাওয়ার পর যা-কিছু সামান্য খুদকুঁড়ো পড়ে ছিল, সব চলে গেল এ ছবি করে।

তা ছাড়া, এ ছবিতে আমাদের একটা প্রাণপণ চেষ্টা ছিল রাজনৈতিক ভাবে কিছু করার, কিছু বলার। আমার এক বন্ধু, যিনি এ দেশের একজন খুব বড় পরিচালক, এ ছবি দেখে আমায় বলেছিলেন, আপনার এ ছবি ভয়ঙ্কর রাজনীতি-ঘেঁষা। আমারও তা-ই ধারণা। তখন বি.টি.আর-এর যুগ, বি.টি. রনদিভে, অর্থাৎ leftism-এর মধ্যে Communist party ঢুকে গিয়েছিল, অনেকটা এখনকার Naxalite রাজনীতির মতো।

(তেলেঙ্গানা অভ্যুত্থানের) অনেকটা সমসাময়িক। '৫১ সালে লেখা, '৫১ সাল পুরো লাগে, একটু-একটু করে পয়সা আসে, একটু করে কাজ হয়। '৫২ সালে ছবি শেষ হয়, censored-ও হয়।

আমার ঐ বন্ধু ঠিকই বলেছিলেন, ছবিটি রাজনৈতিক ছিল।. . . ও-ছবি দেখলে লোকে ভাবত, ঋত্বিক ঘটক রাজনীতির জন্য ছবি করে। ও-ছবিতে রাজনীতি ছিল সোচ্চার ভাবে, বেশি রকম ভাবে। ছেলেমানুষি উচ্ছ্বাসও ছিল। তবু হয়তো কিছু ছিল, জানি না। যাক্‌গে। সে-ছবি recover করার কোন উপায় নেই এখন। তখন ছবির print-গুলো ছিল nitrate-based, ভালো ভাবে না-রাখলে, কিছু দিন vault-এ থাকলেই sticky হয়ে যায়। এখন ফিল্মগুলো একেবারে তাল পাকিয়ে গেছে।

তার পর '৫৬ সালে 'অযান্ত্রিক', '৫৭ সালে বেরোয়। তার পর পর-পর কয়েক বছর ছবি করলাম।

জীবন শুরু করি নিউ থিয়েটার্সের floor-এ, শ্রদ্ধেয় বিমল রায়ের সঙ্গে। পরে, বিমলদা এ ছেড়ে বম্বে যান। আমি যাইনি। এখানে বিমলদার কাছে ছিলাম chief assistant এবং story writer হিশেবে। এর পরে স্বর্গত নির্মল দে-র কাছে story writer এবং chief assistant director হিশেবে কাজ করি।

এই সময়েই 'বেদেনি' ছবিটি শেষ করার ভার আমাকে দেওয়া হয়। কিন্তু নানা কারণে তা শেষ করতে পারিনি। এর পর নিজের গাঁটের পয়সায় 'নাগরিক' বলে একটা ছবি শুরু ও শেষ করি। কিন্তু সেটা আজ পর্যন্ত আঁতুড়ঘর ছেড়ে পৃথিবীর আলো দেখল না। তারপর মাঝখানে ক'বছর ফাঁকা। ফাঁকা হয়ে শুরু করলাম নাটক লেখা ও মঞ্চস্থ করা। কালী বাঁড়ুজ্যে, উৎপল দত্ত, গীতা সোম, শোভা সেন— এরা সব আমার কাছে কাজ করত সে সময়ে। তখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আমি একজন নেতা। সে সব নাটকের মধ্যে যে-নাটকটি বোম্বাই-এ সর্বভারতীয় নাট্য সম্মেলনে প্রথম পুরস্কার পায়, তার নাম 'দলিল'। তাতে আমি নিজেও প্রধান চরিত্রে অভিনয় করি। আমি যে অভিনয় করি, এটা আজকালকার লোকজনেরা বিশেষ জানেন না। এর পরে আমি বম্বে-র ফিল্মিস্তান-এ চাকরি নিয়ে চলে যাই, গল্পলেখক এবং চিত্রনাট্য-লেখক হিশেবে। কিছু পরে আবার বিমল রায়ের জন্য 'মধুমতী' বলে একটি গল্প এবং তার চিত্রনাট্য লিখি। এ ছবি সফল ছবি হিশেবে চলেছে। এর পর হেমেন গুপ্ত, হিতেন চৌধুরী ও রাজ কাপুরের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। কিন্তু পরে সব ছেড়ে দিয়ে আবার কলকাতায় ফিরে আসি শ্রীযুক্ত বি.এন. সরকার-এর অনুরোধে। যে-কোন কারণেই হোক, সরকার সাহেব ছবিটি শুরু করতে পারেননি। তখন শ্রীযুক্ত প্রমোদ লাহিড়ীর অনুরোধে 'অযান্ত্রিক' করি। এর পর আমার নিজের production থেকে করি 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবি। পরের ছবি, একই production-এর— 'কোমল গান্ধার'। পরে, আমার বিশিষ্ট বন্ধু রাধেশ্যাম ঝুনঝুনওয়ালার জন্যে 'সুবর্ণরেখা' ছবি করি। তারপর আবার ফাঁকা সব। অবস্থা যা দাঁড়ায়, আমাকে চাকরি নিতে হয় একটা Vice Principal-এর সরকারি post-এ, পুনায় Film Institute of India-য়। কিছু দিনের মধ্যেই এখানকার স্বরূপ জানতে পারলুম। এখানে সরকারি অব্যবস্থার চরিত্র দেখে আমার ঘৃণা জন্মাল। এবং কয়েক মাস বাদেই আমার কপাল থেকে এ দুর্ভোগ ঝেড়ে ফেলে দিলুম। এখানে থাকার সময় ছোট-ছোট দু-তিনটি ছবি করেছি। সেগুলি কিছু নামও করেছে। সেগুলি হল 'Rendezvous', 'Fear' ইত্যাদি। এর পরে Film Division-এর হয়ে কিছু কাজ করি। তারপর Eastern Railway-র হয়ে কিছু documentary করেছি। বর্তমানে কোন্ ছবিতে আছি না-আছি, তা বলব না।

আমার ছবিগুলো দেখেছি, সেই 'অযান্ত্রিক' থেকে আরম্ভ করে 'সুবর্ণরেখা' অবধি পাঁচখানা ছবিতেই, যখন release হয়, চলে না, একদম চলে না। কয়েক বছর যাবার পর লোকের টনক নড়ে, তখন খানিকটা দেখে-টেখে।

এক 'মেঘে ঢাকা তারা' খানিকটা পয়সার মুখ দেখেছিল, সেটা পুরোপুরি চলে গেল 'কোমল গান্ধার'-এ। 'কোমল গান্ধার'-এ আমার যথাসর্বস্ব ডুবে গেল। ওটারও producer আমি ছিলাম। এর পর দেখলাম যে ব্যবসাদাররা যারা ছবির টাকা দেবে, তারা আমাকে বিষবৎ পরিহার করেছে, কেননা আমি একটা flop director. ছবি release হয়, এত পয়সা খরচ করে করি, এত খাটি-টাটি, কিন্তু কী হয় না-হয় জানি না, মোদ্দা কথা, পয়সা পাই না। কাজেই কেউই আমায় পাত্তা দেয় না।

সেই সময়ে একটা সুযোগ এল Puna Film Institute-এ চাকরির! এই সাত বছর যে আমি ছবি করিনি সেটা ঠিক কার্যকারণ পরম্পরায় ঘটেনি, অনেকটা accidental, পুনার চাকরি তো আমার বেশি দিন ছিল না, দু-বছর, এসেও তো করতে পারতাম, করিনি, মানে ঐ ভাবতাম আবার গিয়ে ভিক্ষে করব? কী রকম ভিখিরি-ভিখিরি মনে হত নিজেকে। এই অবস্থাটা আর মানিয়ে নিতে পারছিলাম না।

পুনায় চাকরির যুগ আমার সবচেয়ে আনন্দময় যুগের মধ্যে একটা। সেখানে নতুন ছেলেমেয়েরা অনেক আশা নিয়ে, অনেক বাঁদরামি নিয়ে আসে, বাঁদরামি মানে ঐ নতুন মাস্টার এসেছে, তার পেছনে লাগতে হবে। তাদের মধ্যে গিয়ে আমি ঝপাং করে পড়লাম। তাদের মন জয় করা, তাদের বলা যে ছবি অন্য ধরনের হয়, এর যা আনন্দ ঠিক বলে বোঝানো যাবে না, অন্য ধরনের আনন্দ যে অনেক ছেলেমেয়ে গড়লাম। আমার ছাত্রের দল সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে, কেউ নাম করেছে, কেউ করেনি, কেউ দাঁড়িয়েছে, কেউ ভেসে গেছে।. . .

মণি কাউল আমার ছাত্র— ভীষণ ভাবেই আমার ছাত্র, মণি, কুমার সাহানি, ঐ batch-টা। কে.টি. জন। কে.টি. জন এখন কেরালাতে আছে। শত্রুঘ্ন সিনহা, রেহানা সুলতানা, মহাজন, তারপর ধ্রুবজ্যোতি, এরা সবাই আমার ছাত্র। দিল্লি গিয়ে দেখি sound engineer আর cameraman-এর মধ্যে ভর্তি আমার ছাত্র। এ সব দেখে একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়, মাস্টারদের আনন্দ, যাদের আমি পড়িয়েছি, শিখিয়েছি, তারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, নিজের নিজের sphere-এ তারা successful, এর মধ্যে আমারও contribution আছে বলে গর্বিত মনে করি, rightly or wrongly.

তারপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলকাতায় ফিরে এলাম। লোকের কাছে ভিক্ষে করব না, মাথা নিচু করব না, এই ভাবেই চলছিল। এর মধ্যে drinking-টা ভয়ঙ্কর বেড়ে গেল, বার বার অসুখে পড়তে লাগলাম, আপনারা সবই জানেন, পাগলাগারদের কথাও জানেন।

তা এরই ফাঁকে-ফাঁকে ছবিগুলো করেছি প্রচণ্ড অসুবিধের মধ্যে। কেউ পয়সা দিতে চায় না, documentary-র কাজ পাওয়া যায় না। নানা ধরনের ফ্যাঁকড়া। এর মধ্যে কোনটা একেবারে পয়সাবিহীন অবস্থায় করা, কোনটা একটু ভালো ভাবে করা। চেষ্টা করেছি ভালো ভাবে করার।

ওর মধ্যে West Bengal Government-এর হয়ে করা পুরুলিয়ার 'ছৌ' ছবিটা মনে হয় লোকে দেখতে পারে। 'আমার লেনিন' একটা reportage গোছের, যেটাকে গুছিয়ে একটা গল্পের আকার দেবার চেষ্টা করা হয়েছে, মন্দ হয়নি। এ ছাড়া, পুনায় ছাত্রদের সঙ্গে short তুলেছি দু-একটা। 'Rendezvous' আমার ছাত্রদের সঙ্গে করা। এ ছাড়া 'Fear'— মনে হয়, ওগুলো খারাপ হয়নি।. . . 'Rendezvous'-টা ছেলেরা করেছে আমার তত্ত্বাবধানে, direction students. আর 'Fear'-টা আমি করেছি for acting course.

পুনাতে সিনেমাশিল্পে training দেওয়ার যে-ব্যবস্থা আছে তা মোটেই খারাপ নয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার পর চাকরি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে অত্যন্ত মেধাবী ছেলেমেয়েরা ওখান থেকে বেরিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। কলকাতার studio-তে যারা সহকারীর কাজ করেন তাদেরও শেখার অবকাশ আছে, কিন্তু সিনেমা-ব্যবসার প্রকৃতিটাই এমন যে মৌলিক চিন্তাধারার মানুষেরা কোন সুযোগ পায় না। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই মোট পরিণতিটা একই দাঁড়াচ্ছে।

পুনায় আমি Visiting Professor হিশেবে দু'বছর জড়িত ছিলাম। প্রত্যেক দু'মাস পর-পর যেতাম। দশ দিন করে থাকতাম— চলে আসতাম। তার পর আমি Vice Principal হিশেবে মাত্র তিন মাস ছিলাম। পুনায় আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমি মনে করি আমার জীবনে যে কয়টা সামান্য ছবি করেছি সেগুলি যদি পাল্লার এক দিকে দেওয়া হয় আর মাস্টারিটা যদি আর-এক দিকে দেওয়া হয়, তবে ওজনে এটা অনেক বেশি হবে। কারণ কাশ্মীর থেকে কেরালা, মাদ্রাজ থেকে আসাম পর্যন্ত সর্বত্র আমার ছাত্র-ছাত্রী আজকে উঠছে। I have contributed at least a little in their luck which is much more important than my own film making. আমি বলছি তো ওজনে ওটা অনেক বেশি।

আমি যে-ক'টি ছবি এ পর্যন্ত করেছি, বা করতে দিয়েছেন এ দেশের

মানুষেরা, তার মধ্যে 'অযান্ত্রিক' একটা আলাদা রসের ছবি। 'বাড়ি থেকে পালিয়ে'র এক বিশেষ ঢং আছে, সেটা আমি দর্শকদের ধরাতে পেরেছি বলে মনে হয় না।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে' আমার মতে নতুন ধরনের ছবি। একটি শিশুর চোখ দিয়ে আমি শহরটাকে ঘাঁটতে চেয়েছিলাম। হয়তো সম্পূর্ণ পেরে উঠিনি। কিন্তু কয়েকটি technical পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখানে আমি করেছি যা আজকে সমাদর না-পেলেও ভবিষ্যতের মানুষেরা বুঝবে বলে আশা করি। যেমন ধরুন 18mm extreme wide angle lense-এ panning করে airy effect আনা কিংবা 300mm long focus lense ব্যবহার করে নানা রকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা, যেমন গাড়ির চাকা ঘুরছে তো ঘুরছেই।

'বাড়ি থেকে পালিয়ে' অন্যান্য ছবির থেকে আলাদা। একটি শিশুর চোখে মহানগর। তাই একটা বিশেষ lense ব্যবহার করেছিলাম। ঠিকই, ছবিতে technical কাজ বিশেষ ভাবে করেছি। কিছুটা সময় sound track বিশেষ ভাবে বাজিয়েছি— যেমন ধরুন, যে-speed-এ music take করেছি, তার প্রায় তিন গুণ speed-এ transfer করে ছবিতে ব্যবহার করেছি। Lense 300 long focus-এ বিশেষ angle-এ ছবি তুলেছি। এতে যে-effect হয়েছে তাতে ছবিতে দেখা যাবে যে গাড়ি চলছে, চাকা ঘুরছে অথচ গাড়ি এগোচ্ছে না। দর্শকের কাছে একটা fantastic effect বলে মনে হবে। আবার কোন-কোন জায়গায় 18mm lense-এ object-কে intentional distortion করেছি, এগুলো যেন ছেলেটির চোখ দিয়ে দেখা subjective use.

আবার অন্য একটি জায়গায় cross-reference হিশেবে সুকান্ত ভট্টাচার্যর একটি কবিতা 'চিল'-এর symbol এনে প্রয়োগ করেছি। ছবিতে দেখা যায় ছেলেটির আশাভঙ্গ। ক্যামেরা দেখছে চিল পড়ে আছে। 'চিল' দেখে ঐ কবিতাটির কথাই মনে পড়ে যাবে। ছবির শেষের দিকে একটি মুটেকে দিয়ে important কথা বলিয়েছি 'এ লড়ায়ের জায়গা— কলকাতা শহর— দয়া-মায়া কুছু নেই। যা ঘরে চলে যা।'

('মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' ও 'সুবর্ণরেখা'র) মধ্যে নিশ্চয়ই একটা অন্তর্নিহিত সূত্র আছে। 'মেঘে ঢাকা তারা' was completely my. . . in my subconscious affair. 'কোমল গান্ধার' was a very conscious affair. আমার এই মহিলার সঙ্গে বিবাহ ব্যাপারটা তার সঙ্গে প্রচণ্ড ভাবে জড়িত।

আর 'সুবর্ণরেখা' is a very serious work. ওখানে খাটতে হয়েছে, হ্যাঁ মানসিক ভাবে. . . a work behind. দৈহিক ভাবে খাটার ব্যাপার নয়, মানসিক ভাবে প্রচণ্ড খাটতে হয়েছে এবং এটাকে আমাকে দাঁড় করাতে হয়েছে। কদ্দূর দাঁড়িয়েছে সে আমি জানি না, কিন্তু মিঞা কথা হইত্যাছে যে খাটছি আমি।

যোগসূত্র এই তিনটার মধ্যে একই মাত্র। সেটা হচ্ছে দুই বাংলার মিলন। দুইডা বাংলারে আমি মিলাইতে চাইছি। দুইডারে আমি ভালোবাসি হেইডা কমু গিয়া মিঞা, এবং আমি আজীবন কইয়া যামু, যখন মৃত্যু পর্যন্ত আমি কইয়া যামু। আমি পরোয়াই (করি না), আমার পয়সার পরোয়াই (নাই)। I can fight that out. ঋত্বিক ঘটক can do that out here and in Dhaka. আমারে কে মারব লাথি, মারুক গা যাক। বইয়া গ্যাছে গিয়া।

এই বাংলাদেশ ভাগ হয়ে-যাওয়াটা আমাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনকে তোলপাড় করে তুলেছিল। সেই সময়ে আপনাদের বয়স কত ছিল আমি জানি না, তবে তখন জ্ঞানগম্যি যাদের হয়েছিল তাদের জিজ্ঞেস করলে বুঝতে পারবেন, আজকের সমস্ত অর্থনীতিটা যে চুরমার হয়ে গেছে তার basic factor ছিল ঐ বাংলাভাগ।

বাংলা ভাগটাকে আমি কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনি। আজও পারি না। আর ঐ তিনটে ছবিতে আমি ও-কথাই বলতে চেয়েছি। ইচ্ছে না-থাকা সত্ত্বেও হয়ে গেল একটা trilogy : 'মেঘে ঢাকা তারা', 'কোমল গান্ধার' আর 'সুবর্ণরেখা'। আমি 'মেঘে ঢাকা তারা' দিয়ে যখন আরম্ভ করলাম তখনও আমি রাজনৈতিক মিলনের কথা বলিনি, এখনও ভাবি না। কারণ ইতিহাসে যা হয়ে গেছে তা পালটানো ভীষণ মুশকিল। সেটা আমার কাজও নয়। সাংস্কৃতিক মিলনের পথে যে-বাধা, যে-ছেদ, যার মধ্যে রাজনীতি-অর্থনীতি সবই এসে পড়ে, সেটাই আমাকে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছিল। আর এই সাংস্কৃতিক মিলনের কথাই 'কোমল গান্ধার'-এ পরিষ্কার করে বলা আছে, 'মেঘে ঢাকা তারা'র ভেতরকার কথাও তাই, 'সুবর্ণরেখা'তেও সেই একই কথা।

এখন অবশ্য অর্থনৈতিক সমস্যা নানান গণ্ডগোলে জড়িয়ে গেছে, তবু ভালো করে ভেবে দেখুন বহু অর্থনৈতিক সমস্যার জট হচ্ছে ঐ দেশভাগ। একেবারে দু'টুকরো করে দিল দেশটাকে, একেবারে ছিনিমিনি খেলে গেল এরা।. . .

দেশবিভাগটায় গোড়ার থেকেই আমার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। এবং সে

আক্রমণ বোধ হয় আমার শেষ ছবিতেও আছে। আমি, রাজনৈতিক মিলনের কথাবার্তা. . . ও-সমস্তর মধ্যে আমি নেই। কারণ, আমি ওগুলি বুঝিও না, আর আমার দরকারও নেই। কিন্তু সাংস্কৃতিক মিলন— আমি দুই বাংলাতেই কাজ করেছি, এবং করছি। এবং আমার থেকে বেশি কেউ করেনি। ও-বাংলার খবর আমার থেকে বেশি কেউ রাখে না। আমি যে-ভাবে গিয়ে ওখানে পড়ে (থেকে) কাজ করেছি এবং ঐ ছেলেমেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে, আমি যা দেখেছি বা আমি যে-ভাবে মিশেছি, কেউ এখানকার বলতে পারবে না যে সে-ভাবে যেতে পারবে। এবং কেউ গিয়ে ওখানে এ ভাবে লড়াই করতে পারবে। আমি হয়তো আবার যাব দিন-কয়েক বাদে। কিন্তু সেটা point নয়। কথা হচ্ছে যে দুই বাংলার এই একটা গণ্ডগোল পাকানো— যেটা এই ছবিতেই বলা আছে আমার— it is a great betrayal. বাংলাদেশ এক। এখানে একটা প্রীতির প্রশ্ন আছে। চেষ্টা করলে আমরা এই মুহূর্তে মিলিত হতে পারি। সেইটাকে completely in a rascally way কেটে ভাগ করা হয়েছে। এটা একটা অত্যন্ত artificial ব্যাপার। এবং এটাকে ক্ষমা করার কোন কারও অধিকার নেই। এখন ঐতিহাসিক ভাবে, মানে পঁচিশ-সাতাশ বছর চলে গেছে, কাজেই দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে ইত্যাদি-ইত্যাদি। কাজেই, you cannot help it. কিন্তু কথা হচ্ছে যে, সাংস্কৃতিক ভাবে বাঙালিদেরকে বদল করা সম্ভবপর নয়। সংস্কৃতি এক।

আমি শিল্পী হিশেবে involvement-এ বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি যে চারপাশের মানুষের জীবনের সাথে নাড়ির যোগ রেখে ছবি করতে হয়। তা না-হলে ছবি করার কোন মানে হয় না।

যে-কোন সৎ শিল্পীকেই সমাজের অংশীদার হতে হবে, লক্ষ মানুষের জীবনের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং তাদের সংগ্রামের অংশীদার হতে হবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক ব্যবস্থার সাথে, দিকে-দিকে প্রসারিত আন্দোলনের সাথে গভীর যোগাযোগ না-রাখলে আমার দ্বারা, যে-কোন শিল্পীর দ্বারা ভালো ছবি তৈরি করা কিছুতেই সম্ভব হবে না।

তাই আমি বিশ্বাস করি, প্রতিটি শিল্পীর কর্তব্য এবং প্রয়োজন এই involvement. সেই সাথে audience-কে alienate করব। এই দুটি বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক। একটি শিল্পকর্মের প্রসঙ্গে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। শিল্পী তার শিল্পকর্মে যে-বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তার সাথে সে যদি ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে না-থাকে, যদি সে-বিষয়টি তার পূর্বপরিচিতের গণ্ডির ভেতর না-হয় তবে তার প্রকাশভঙ্গিতে জড়তা থেকে যাবে, সে তার বক্তব্যকে

বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রকাশ করতে পারবে না। তা ছাড়াও কোন কিছুর সাথে deeply involved না-হলে সেই বিষয় সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা বা প্রেম জন্মাবে না। এই রূপ আবেগসঞ্জাত কোন কিছু শিল্পীর হৃদয়ে develope করলেই তাকে সে দৃঢ় ভাবে প্রকাশ করতে পারবে, এবং প্রকাশভঙ্গির মধ্যে দিয়ে দর্শককে সম্পূর্ণ alienate করতে পারবে। দর্শকদের alienate করা involve করার জন্যই।

আমি কোন সময়েই একটা সাধারণ পুতু-পুতু মার্কা গল্প বলি না— যে একটি ছেলে একটি মেয়ে প্রেমে পড়েছে, প্রথমে মিলতে পারছে না, তাই দুঃখ পাচ্ছে, পরে মিলে গেল বা একজন পটল তুলল— এমন বস্তাপচা সাজানো গল্প লিখে বা ছবি করে নির্বোধ দর্শকদের খুব হাসিয়ে বা কাঁদিয়ে ঐ গল্পের মধ্যে involve করিয়ে দিলাম, দু'মিনিটেই তারা ছবির কথা ভুলে গেল, খুব খুশি হয়ে বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল— এর মধ্যে আমি নেই।

আমি প্রতি মুহূর্তে আপনাকে ধাক্কা দিয়ে বোঝাব it is not an imaginary story, বা আমি আপনাকে শস্তা আনন্দ দিতে আসিনি। প্রতি মুহূর্তে আপনাকে hammer করে বোঝাব যে যা দেখছেন তা একটা কল্পিত ঘটনা, কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যেটা বোঝাতে চাইছি আমার সেই thesis-টা বুঝুন, সেটা সম্পূর্ণ সত্যি। সেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্যই আমি আপনাকে alienate করব প্রতি মুহূর্তে।

যদি আপনি সচেতন হয়ে ওঠেন, ছবি দেখে বেরিয়ে এসে বাইরের সেই সামাজিক বাধা বা দুর্নীতি বদলানোর কাজে লিপ্ত হয়ে ওঠেন, আমার protest-কে যদি আপনার মধ্যে চারিয়ে দিতে পারি, তবেই শিল্পী হিশেবে আমার সার্থকতা।

এই জন্যই বলছি involvement হচ্ছে শিল্পীর, alienation হচ্ছে audience-এর। আমি যে কতগুলো কল্পিত ঘটনা ও চরিত্র সাজিয়ে গল্প বলছি, তার মধ্যে কিছু বক্তব্য রাখছি, সেগুলো দেখে আপনারা আবার ভুল কি ঠিক, ভালো কি মন্দ তা বিচার করুন, যদি ভালো বোধ করেন তবে বাইরে গিয়ে বাস্তবকে বদলানোর কাজে নিযুক্ত হোন। এই alienation সকল আধুনিক শিল্প বা অন্য শিল্পেরও লক্ষ্য।

দেখুন, দর্শককে অবহেলা করে কোন শিল্পীই শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন না। প্রত্যেকেরই মাথার মধ্যে ঘোরে যে দর্শক ছবিটিকে ভালোবাসবে কি না। কাজেই এটা মিথ্যে কথা বলা হবে যদি কোন শিল্পী বলেন যে দর্শকদের কথা

ভুলে গিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তবে আত্মপ্রেরণার একটা প্রশ্ন আছে, বিবেকের একটা প্রশ্ন আছে, শিল্পী সেইখানে হয়তো বাধা পেতে পারেন। সেখানে দর্শকেরা ছবি দেখতে না-ও চাইতে পারেন। সেখানে কিছু করার নেই। কারণ শিল্পী সাময়িক প্রয়োজনের কাছে মাথা নিচু করতে প্রস্তুত নন।

(Communication নিয়ে) আমার প্রাথমিক ভাবে সম্পূর্ণ বয়ে গেছে। এক, আমার কথা কে গ্রহণ করল আর কে করল না— তার ভিত্তিতে আমার জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না, এবং এই সব ধরনের প্রশ্নের কোন মূল্য নাই। দয়া কইর‍্যা ভদ্র ধরনের প্রশ্ন করবেন।

আমি আজ পর্যন্ত কোন ছবি অন্য কারও কথা ভেবে করিনি। সে-ছবি যদি আপনাদের ভালো না-লাগে তা হলে সত্যি কথা বলতে কী আমার কিছু যায়-আসে না। আমি যা করতে চাই তা-ই করব, তার বাইরে আমি যাব না।

শিল্পী খুঁজে ফেরেন। কখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছে যান, কখনও হয়তো কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। কিন্তু দুটোই ঠিক। শিল্পীর চেষ্টা থাকে, যে-চেষ্টার অবসানও একবার হয়। কিন্তু ঐ যে প্রশ্ন তুলল সেইটাই মানুষকে আকর্ষণ করে, নাড়া দেয়, মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। সেইখানেই শিল্পীর সার্থকতা।

নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকাই শিল্পীর উচিত।

আমৃত্যু আমার জীবনে compromise করা সম্ভব নয়। সম্ভব হলে তা অনেক আগেই করতাম এবং ভালো ছেলের মতো বেশ গুছিয়ে বসতাম কেতা নিয়ে। কিন্তু তা হয়ে উঠল না, সম্ভবত হবেও না। তাতে বাঁচতে হয় বাঁচব, না হলে বাঁচব না। তবে ঐ ভাবে শিল্পকে কোলবালিশ করে বাঁচতে চাই না।

ছবি লোকে করে সাধারণত দুটি কারণে— একটি খ্যাতির বিড়ম্বনা, অন্যটি অর্থাগম। এ দুয়ের কোনটির উদ্দেশ্যেই আমার ছবি করার বাসনা নেই। আমি যদি ছবি করতে চাই সেটা সম্পূর্ণ হবে— আমার কিছু দিগ্‌দর্শন আছে, জগৎ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা আছে, সেগুলি ঠিক বা ভুল যা-ই হোক না কেন— তা প্রকাশ করা সম্পর্কে। আমি খ্যাতি কিংবা ইনামও চাই না— অর্থও চাই না। মানুষের তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে যেটুকু অর্থের দরকার হয়, সামান্য সেটুকু মাত্র পেলেই আমি নিশ্চিন্ত। আর, খ্যাতির ভুলে আমি ঢুকতে প্রস্তুত নই। কাজেই কোন আপোসের মধ্যে ঢুকতে আমি

একদম তৈরি নই। Compromise করলে হয়তো কিছু পয়সা পাওয়া যেত, কিন্তু তার চোরা গলিতে জীবন থাকতে নিজেকে পাচার করতে পারব না।

শিল্পী হিশেবে লড়াই করার একটা প্রশ্ন আছে, সেটাই আমার কাছে বড় প্রশ্ন। নিজের স্বপ্ন নিয়ে লড়াই, সেটা তো সহজে বাইরের কাউকে বোঝানো যায় না। বোঝানোর কিছু দরকার আছে বলেও আমি মনে করি না। আমার জীবনের লড়াই হচ্ছে সেই লড়াই। এর মধ্যে রাজনীতির কোন ব্যাপার নেই। ঝগড়ার কোন ব্যাপার নেই। এটা সম্পূর্ণ নিজের খাটার ব্যাপার। জানি না, কোন দিন পেরে উঠব কি না। আজও তো পারিনি। যদি পারি, আপনারা কিছু দেখবেন।

রাজনীতি সম্পর্কিত হওয়া মানে, শিল্পী-টিল্পি নয়, যে-কোন মানুষকে এই সমাজে, এই শ্রেণীসমাজে, রাজনীতি সম্বন্ধে সম্পৃক্ত হয়ে থাকতে হয়। এটা শিল্পী শুধু নয়, সব্বায়েরই হওয়া উচিত। তবে তাই বলে slogan mongering শিল্পীর কাজ না। এই cheap slogan দিয়ে শিল্পী হয় না, শিল্পীকে কাজ করতে হয় মানুষের গভীরে। রাজনীতিকরা কাজ করে ওপরতলায়— মানে চেঁচামেচি, হট্টগোল, cheap slogan, একটা short slogan, এই সব। শিল্পী এইগুলো করলে, আমি মনে করি, সেটা শিল্প আর থাকে না।

(শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব) সম্পূর্ণ আছে। সামাজিক দায়িত্ব যারা avoid করে তারাও সামাজিক দায়িত্বই পালন করছে। অর্থাৎ তারা ওপরতলার শুয়োরের বাচ্চাদেরকে সাহায্য করছে। সামাজিক দায়িত্ব প্রত্যেকেই পালন করছে।

(আমাদের দেশের শিল্পীদের প্রাথমিক দায়িত্ব) মানুষকে সেবা করা। আবার প্রাথমিক দায়িত্ব আর আন্তিক দায়িত্ব, দুটোই তো এক। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষকে সেবা করা, মানুষের জন্য কথা বলা— সেটা শিল্প-সম্মত হওয়া উচিত, এই অব্দি। Slogan mongering নয়।

কেউই রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন না।. . . এরা রাজনীতিতে একটা পক্ষ নিয়ে বসে আছেন, সেটার pose হচ্ছে. . . I am not commited. One cannot be non-commited. You are either for this or for that. কাজেই এরা কেউ বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন না, এরা মানুষের সব্বোনাশ করার চেষ্টা করছেন।

(আজকের ফিকে commitment নিয়ে) আমার প্রতিক্রিয়া তীব্র। এরা হয়েছেন কেন, না, শস্তায় বাজিমাত করার একটা চেষ্টা চালু হয়েছে এখন। আমি তো বললাম (রাস্তায়) আসতে-আসতে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়।

আপনারা যদি রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা'র ওপরে লেখাটা পড়েন— সংকলনে আছে— সেখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে বললেন যে 'সময় তাহার পর হইতে কেমন যেন ইতর হইয়া আসিয়াছে।' তো, সময় ক্রমশ ইতর হয়ে এসেছে। ছেলেপুলেরা কী রকম irresponsible. তার মানে হচ্ছে যে আস্তে-আস্তে একটা morality শেষ হয়ে যাচ্ছে। এবং এটা হচ্ছে ভাঙনের লক্ষণ। সম্পূর্ণ ভাঙছে। ভেঙে একটা নতুন কিছু হবেই আমি জানি। সেটা হয়তো আমার ছেলের সময়ে হবে, নইলে আমার নাতির সময়ে হবে। আমাদের সময়ে হবে বলে আমি আর আশা করি না। কাজেই শিল্পীদের আলাদা করে ইয়ে করার কোন দরকার নেই। তারা তারই লক্ষণ।

(Commitment নষ্ট হবার পেছনে বামপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের) দায়িত্ব পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এঁরা কেউই বামে নেই। এঁরা সব দক্ষিণে চলে গেছেন। কোন উপায় নেই। একটা নেতা নেই যাকে বলা যায় সত্যিকারের বামপন্থী নেতা। কাজেই বামপন্থী নেতা. . . ঐ. . . তাদের দায়িত্ব কী? তারা তো কেউ নেই-ই, মানে সব দক্ষিণপন্থী এখন। কী করে নিজের পকেটে কিছু টাকা ঢোকানো যায়, কী করে আমার একটা নাম করা যায়, কী করে খবরের কাগজে আমার নামটা ছাপা হবে, এই হচ্ছে একমাত্র চেষ্টা! দেশের মানুষের ভালো করার চেষ্টা কারওই নেই। কাজেই তাদের দায়িত্ব আসে কোত্থেকে, মানে, বলি কোত্থেকে? পাচ্ছি না তো! বললামই তো আগে যে নকশালবাদী ছেলেগুলোর মধ্যে থেকে যদি বেরোয়. . .

PWA : Progressive Writers' Association. মানে, গণনাট্য সংঘের জন্ম হয় কিন্তু আমাদের PWA-র under-এ। তারপরে আস্তে-আস্তে আমরা দুটো ইয়েতে যাই। মানে, একই জায়গায়, একই বাড়িতে। ঐ ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে। একই জায়গায় কাজ করি আমরা। সেই সময় এই ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং এইগুলো আমাদের কাছে একটা ভয়ঙ্কর প্রয়োজনীয় জিনিশ ছিল। আজকে এ ধরনের আন্দোলন হওয়া অসম্ভব প্রয়োজন। কারণ, আমি খুব ভালো করে বুঝতে পারছি, কারণ (আমার) মোটামুটি ভাবে দিল্লির সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। আমি নাম করব না, একটা fascist চেহারা নেবার চেষ্টা এখানে আবার আরম্ভ হয়েছে। কাজেই অসম্ভব প্রয়োজন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকালকার ছেলেপুলেদের মনোবৃত্তি আমি জানি না কতখানি principled. সে রকম ছেলেপুলেরা যদি থাকে তাদের উচিত— মানে আমি 100% sure— এ সমস্ত জিনিশ (করা)। কারণ CIA-রা যা করে বেড়াচ্ছে দিল্লিতে। এগুলো আমি নাম একদম করতে চাই না— খুব নাম-করা

লোকেরা তার মধ্যে রয়েছে। এবং তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি। আজকালকার ছেলেপুলেদের এগুলো করা উচিত। কিন্তু আজকালকার ছেলেপুলেদের unfortunately আমি দেখছি যে এদের মধ্যে এ সমস্ত মনোবৃত্তি থাকলে. . . একমাত্র নকশালবাদী ছেলেরা ছাড়া. . . আর কারও মধ্যে কিস্যু নেই।

(নকশালদের প্রতি) স্নেহপ্রবণ তো হতে বাধ্য আমি।. . . হিশেবের বাইরে কেন? আমি তাদের সঙ্গে, তাদের মতামত এবং তাদের আদর্শের সঙ্গে একদম একমত নই। কিন্তু তাদের সততা? সেটাকে শ্রদ্ধা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আর তো কাউকে দেখি না। এই বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেগুলো— এদের আর কিছু নয়— এরা সম্পূর্ণ misguided. যেটা আমার ছবিতেও আমি বলেছি। কিন্তু এদের সততার কোন তুলনা নেই। এরা নিজেদের জন্য কিছু চায় না, এরা দেশের জন্য চায়। সেটাকে আমি শ্রদ্ধা করব না? সেটাকে আমি পুজো করব না? করতেই হবে।

সমাজ অত্যন্ত জটিল বস্তু। এর মধ্যে বহু ধারা-উপধারা প্রবাহিত। কোন্ ধারাকে ধরে কী ভাবে এগোব— এটাই প্রাথমিক প্রশ্ন।

এখন এ দেশের যা অবস্থা, যে-অব্যবস্থা, সমস্তই হচ্ছে ঐ Great Betrayal, সেই '৪৭-এর তথাকথিত 'স্বাধীনতা'র result. এটা আমি ছবিতে বলেছি। এখন আমরা কীসের মধ্যে দিয়ে pass করছি? Neo-colonialism, absolutely neo-colonialism, এটা আমি ছবিতে বলিনি। এ কথাগুলো বলতে গেলে আমার ছবি রাজনীতি হয়ে দাঁড়াত, ছবি হত না। আমি in human terms ব্যাপারটা ছবিতে বলার চেষ্টা করেছি।

আমি মনে করি slogan mongering করে, বড়-বড় বাতেলা করে সমাধান দেখিয়ে দেওয়া আমার কাজ নয়। আমার নিজের ধারণা এ দেশে কেউ সে ভাবে সমস্যাগুলোকে ধরার চেষ্টা করেনি। আমি যদি সেটা করতে পারি, লোকের সামনে ছুঁড়ে ফেলতে পারি যে এই হল তোমাদের সমস্যা, এখন ভাবো— What is to be done— তা হলেই যথেষ্ট। আমার মনে হয় এটাই আমার কাজ।

সমস্যাটা কোথায়, everybody knows. সমাজের সেই উচ্চতম স্তর থেকে নিম্নতম পর্যন্ত আমি মিশি, আমি মিশেছি— প্রত্যেকে জানে। এক দল আছে যারা এই অবস্থা থেকে ক্ষীর লুটছে, ননী লুটছে, সব লুটছে, কাজেই এই অবস্থাটা তারা perpetuate করতে চায়। আর-এক দল দিশেহারা

হয়ে ঘুরছে কতকগুলো নেতার পেছনে, যেগুলো প্রত্যেকটা চোর, প্রত্যেকে তাদের নাম বজায় রাখা, পয়সা করা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। এরা এই সব লোকের দ্বারা বিভ্রান্ত। এই হল অবস্থা, কিন্তু কারও কাছে কোন কিছু লুকনো নেই। জিনিশটা অত্যন্ত প্রকট, সূর্যের আলোর মতো প্রকট। এই যে ছেলেপিলেগুলো বখে যাচ্ছে, রাস্তায় বেরলে দেখি আজকালকার ছেলেপুলেরা যে-ধরনের behaviour করে তা বলা যায় না, এ সমস্তই হচ্ছে frustration-এর ফলে।

এবং এখন আমার নিজের ধারণা দুটো রাস্তা পরিষ্কার— হয় straight Fascism, আর নইলে Leninist পথে কোন কিছু। তোমরা যদি ১৯২৯ থেকে '৩৩ সালের জার্মানির দিকে তাকিয়ে দেখো তো দেখবে যে, এই যে এখানে ১৫-১৬ বছর থেকে ২০-২৫ বছরের ছেলেরা বাঁদরামি করে বেড়াচ্ছে, এটা যেন তারই প্রতিরূপ। এরাই SS, এরাই Gestapo, এই lumpen-দের থেকেই তৈরি হচ্ছে ভীষণ ভাবে। গোটা সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে চুরমার হয়ে— দুটো পথ খোলা— হয় Leninist পদ্ধতিতে নিয়ে যাবার একটা ব্যাপার আছে, নইলে clean Fascism হবে। এবং আমার ধারণা, within 3, 4 or 5 years এটা হবে— হয় এ দিকে, নয় ও-দিকে। এ চলতে পারে না। ছবিতে এ বলার অবকাশ নেই, কেননা আমি জানি এ দেশে leadership বলে কোন পদার্থ নেই।

(কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে, নেতৃত্বের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে) সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। যার জন্য আমি পার্টি ছেড়েছি। পি.সি. যোশির অনেক দোষ থাকতে পারে, কিন্তু যোশি এই জিনিশগুলো অসম্ভব ভাবে বুঝতেন। এবং প্রত্যেককে নালিশ করতেন, এবং individual comrade-দের. . . কবে আমার বৌ লক্ষ্মী party comrade ছিল. . . শিলং কমিটির সেক্রেটারি ছিল আমার বৌ. . . ভুলে যাওয়া উচিত. . . ও শালা ঐখান থেকে, দিল্লি থেকে— মারা যাবে এখন, মানে শেষ হয়ে এসেছে. . . এই কয়েক দিন আগেও চিঠি লিখেছে। আমি গেলে দিল্লিতে আমাকে first ডেকে পাঠায় যে, come. মানে আমি বা লক্ষ্মী বলে নয়, মানে লোকটার ছিল প্রত্যেকটা individual comrade-কে খোঁজ নেওয়া, খবর নেওয়া। এই ছিল অবস্থা। এবং এই লোকটা থাকলে. . . এবং এ গান্ধিকে এলাহাবাদ conference-এ শুইয়ে দিয়েছিল। মানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি was completely finished up by পি.সি. যোশি। তাঁকে এরা— আমি নাম বলব না কমরেডদের— পার্টি থেকে clique করে তাড়াল। এই যে-দিন তাড়াল,

that is in '48 August, Wellington Conference-এ। Wellington Square-এ Conference হয়, Second Conference নামে। সেই সময় থেকে এরা দায়িত্ব-ফায়িত্ব সব off করে দিয়েছে। এবং তারা যা ধেড়িয়েছে সে সব বলে আর লাভ নেই।

(এখন). . . দুর্ভিক্ষের চূড়ান্ত চলছে এবং সেটা কী চলছে আপনাদের ধারণা নেই। আমি ছবি করতে গিয়ে দেখেছি। এবং আমার contact রয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমার করার কী আছে? আমার ব্যক্তিগত ছোটখাটো ভাবে আমি করছি। কারণ আমি রাজনীতিক নই, কাজেই আমি তো আর organise করতে পারব না। কিন্তু আমি যেটুকু পারি সেটাতে কিছুই কাজ হবে না। শিল্প দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

(আর) অপসংস্কৃতি কথাটাই আমার কাছে অত্যন্ত ন্যক্কারজনক লাগে— এক। আর এই ছোঁড়াগুলো যা করে বেড়াচ্ছে তাদের কোন দোষ নেই। সমাজব্যবস্থা ভাঙতে-ভাঙতে— আগেই আমি বলেছি— এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছে যে একে রোধ করার কোন উপায় আপনার-আমার নেই। কারওরই নেই। কারণ এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ শ্রেণী-সমাজের আর্থিক অবস্থা। আজকের ছেলেমেয়েরা চাকরি পায় না। সত্তর হাজার এঞ্জিনিয়র কলকাতা শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাচ্চা-বাচ্চা ছেলে, তারা কাজ পায় না। তারা রকবাজি করবে না কেন? এর কোন উপায় নেই। তারপরে family system ভেঙে যাচ্ছে। আগে বাবা-মায়ের ওপরে একটা প্রেম, ভালোবাসা বা শ্রদ্ধা বা যা-কিছু একটা ছিল। এখন আপনি দেখবেন, সে সবগুলো আস্তে-আস্তে ভাঙছে, সমস্ত জিনিশটাই তো ভাঙছে, মানে মানবিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যাচ্ছে। তা এরা রকবাজি করবেই, বদমাইশি করবেই এরা, রাস্তাঘাটে মাস্তানি করে বেড়াবে। This is inevitable. একটা সমাজ যখন চুরমার হয়— তখন এই ভাবেই হয়। কাজেই এর বিরুদ্ধে কিছু করা এখন, এই মুহূর্তে. . . আমরা দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে পারি, কিন্তু তার দ্বারা কম্ম হবে বলে আমি মনে করি না।

(রাজনৈতিক মতাদর্শ) ব্যাখ্যার কথা না। ওতে ১৯৭১ সাল থেকে '৭২ সালে পশ্চিমবাংলার যে-রাজনৈতিক পটভূমি এবং সেটাকে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি তা চিত্রায়িত করা হয়েছে। তাতে কোন মতবাদের ব্যাপার নেই। আমি সেটাকে দেখেছি from a point of view of not a politician. Political কোন মতবাদকে, যেমন Naxalite মতবাদকে আমার please করার কথা না, ইন্দিরা গান্ধিকে please করার কথা না, CPM-কে please করার

দরকার নেই, CPI-কেও please করার দরকার নেই— আমার থাকলেও ছবিতে আমি slogan-এ বিশ্বাস করি না। ওর থেকে যদি কিছু emerge করে, through situation, through conflict একটা কিছু যদি তোমাদের mind-এ আসে তো এল। কিন্তু আমি এইটেই solution, বলতে পারি না।

তিনটি কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আমার আপত্তি, ওটা ফিল্মের কোন ব্যাপার নয়। ওটা 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'তে আমার বক্তব্য থেকে বেরিয়ে আসবে আর রাজনীতির আলোচনা আমি করতে পারি। ৮-১০ ঘণ্টা আমি বলতে পারি। কিন্তু why— লাভটা কী? ওর সাথে ফিল্মের কী সম্পর্ক আছে? কম্যুনিস্ট পার্টি-ফার্টির কথা তুলে লাভ কী আছে? আমি তো মনে করি না যে as a filmmaker আমার politics নিয়ে কথা বলা উচিত। As a social being I may have some feelings, some ideas. যা আছে এটা নিয়ে আমি কোন মতামত দিতে চাই না।

আমি কীসেতে বিশ্বাস করি সেটা আমার অন্য জায়গায়। As an artist আমি সেটাকে চাপাতে চাই না। আমি mainly present করতে চাই যে এই ব্যাপারগুলো হয়েছে। এখন তুমি decide করো।

(Ideology) automatically থাকবেই ভিতরে, কিন্তু সেটা সোচ্চার নয়। তোমরা 'সুবর্ণরেখা' দেখোনি? এতে ideology নেই? এতেও থাকবে।

আশাবাদ ছাড়াও ideology একটা definitely আছে। Analysis of the condition of the then West Bengal. তারপরে একটা comment আছে তো? এখানেও একটা comment থাকবে। আর সেই comment-টা দিয়ে আমি একটা slogan mongering বা ঐ সমস্তের মধ্যে নেই।

আমার মনে হয় দার্শনিক সমস্যা একা-একা প্রকাশিত হতে পারে না, তাকে সামাজিক সমস্যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে হয়। সে জন্যে আমার ছবিতে সমস্যাগুলিকে সামাজিক সমস্যা রূপেই প্রকাশ করেছি।

আমার চিন্তাভাবনা প্রভাবিত হয়েছে প্রধানত মার্কস এবং লেনিন-এর চিন্তা থেকে। বুদ্ধদেবও আমাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছেন এবং তাঁর চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত কাশ্মীরের সর্বাস্তিবাদী দর্শন থেকেও আমি বিশেষ অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তা ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে আমি ঘুরে কাটিয়েছি। সেখানে গ্রাম্য গান সংগ্রহ করার সময়ে আমি বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মিশেছি এবং তাঁদের দর্শনের সাথে পরিচিত হয়েছি। এ সমস্তই

আমাকে বিচলিত করেছে। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না, যেমন বিশ্বাস করি না বিশেষ কোন পার্টি-র চিন্তাধারায়।

আমি সিনেমার ভাষা শিখেছি আইজেনস্টাইন-এর কাছে। কিন্তু তাঁর দ্বারা আমি প্রভাবিত নই, এ কথা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি। অন্য চলচ্চিত্র-কারদের মধ্যে তীব্র সমাজ-সমালোচক লুইস বুনুয়েল-এর স্থান আমার কাছে সবচেয়ে ওপরে। মহাকাব্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার তুলনা বিচারে কোজিনৎসেভ অদ্বিতীয়। আপন শিল্পশৈলীতে সৃষ্ট অলৌকিক জগতের সঙ্গে লৌকিক জগতের তুলনা করার দক্ষতায় মিজোগুচি-র সমকক্ষ কেউ নেই। অন্যান্য চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে আমি জাপানের কুরোশাওয়া এবং ওশিমা, ফ্রান্সের ব্রেসঁ ও গোদার, গ্রিস-এর কাকোয়ানিস এবং মেক্সিকোর ভ্লাদিমির নেসন-এর প্রশংসা করি। ফেলিনি এবং পাসোলিনি-ও মহান চলচ্চিত্রকার। ভিসকন্তি ওপরে-ওপরে কমিউনিস্ট, কিন্তু উনি নিজের শ্রেণী-মূল্যবোধ ত্যাগ করতে পারেননি। ডি সিকা জীবনের অন্তিম পর্যায়ে বেশ শিথিল হয়ে পড়েছিলেন, বলা যায় প্রায় টেনে-হিঁচড়ে চলেছিলেন। হলিউড-এর গ্রিফিথ, ফ্ল্যাহার্টি এবং জন ফোর্ড-ও খুব উঁচু দরের পরিচালক।

আমার মতে বর্তমান চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন লুইস বুনুয়েল। তাঁর চার-পাঁচটি ছবি আমি দেখেছি। ছবিগুলি আমাকে একেবারে পাগল করে দিয়েছে। বুনুয়েল-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিশৃঙ্খলা এবং তার মধ্যে দিয়ে আমাদের একটি ছন্দে পৌঁছে দেওয়া। তিনি আমাদের মতো সাধারণ পরিচালকদের ভঙ্গিতে গুছিয়ে শট তোলেন না বা গুছিয়ে গল্প সাজান না। মনে হবে যেন তিনি পরম অবহেলায় ছবি তুলেছেন অথচ প্রায়শ এক-একটি মারাত্মক মুহূর্তে তিনি আমাদের নিয়ে যান যা রীতিমতো স্তম্ভিত করে দেয়।

এ ছাড়া কয়েক জন জাপানি পরিচালকের ছবি আমার খুব ভালো লাগে। তবে তাদের সমস্ত ছবি নয়। আন্দ্রেই তারকোভস্কি একটি মাত্র ছবি করার পর আর ছবি করেননি, কিন্তু ছবিটি আমার ভালো লেগেছিল। গ্রিস-এর কাকোয়ানিস ভবিষ্যতে একজন শক্তিশালী পরিচালক হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। রোগোসিন-এর মতো পরিচালককে আমি পছন্দ করি না। সমস্ত ফরাসি School-টাই আমার কাছে বিরক্তির বিষয়। British School-এর 'Room at the Top' আমার কাছে অতি সাধারণ মনে হয়। 'A Kind of Loving' ছবিটি অবশ্য ব্যতিক্রম। এ ছাড়া কার্ল ড্রেয়ার পরিচালিত

'The Passion of Joan of Arc' ছবিটি আমাকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছে। প্রসঙ্গত, এ ছবিতে অভিনয়-কালে নায়িকার ওপর এত প্রবল মানসিক চাপ পড়ে যে shooting শেষ হওয়ার ছ'মাস বাদে তিনি আত্মহত্যা করেন।

চলচ্চিত্রশিল্পে আমি বলে নয়, যাঁরা পৃথিবীর সবচেয়ে serious শিল্পী এবং আমার বাংলাদেশেও যারা serious কাজ করেন, যাদের নাম-টাম আপনারা শুনেছেন-টুনেছেন, প্রত্যেকেই একজনের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেই ব্যক্তিটি হচ্ছেন সের্গেই আইজেনস্টাইন। আইজেনস্টাইন না-থাকলে আমরা কাজ-কম্মর 'ক'ও শিখতাম না। উনি আমাদের বাবা। আমাদের পিতা। তাঁর লেখা, তাঁর thesis এবং তাঁর ছবি— এগুলো ছোটবেলায় আমাদেরকে পাগল করেছিল। এবং তখন ওগুলো আসত না। বহু কষ্টে লুকিয়ে-লুকিয়ে নিয়ে আসা হত। এই আইজেনস্টাইন. . . সত্যজিৎ রায়কেও আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন, he will admit, that, he is the father of us. আর (তাঁর থেকেই) আমরা ছবি কাটতে শিখেছি. . . filmmaking-এ ওটা একটা ব্যাপার। তারপরে পুদভকিন সাহেব। পুদভকিন এসেছিলেন ১৯৪৯ সালে। তখন আমার সৌভাগ্য হয়েছিল পার্টির তরফ থেকে. . . পার্টি আমাকে চাপিয়ে দিল যে পুদভকিন-এর একটু পিছনে-পিছনে ঘোরো। এই পুদভকিন একটা কথা আমাকে বলে দিয়েছিলেন সে দিন, সেটা আমার শিক্ষার basis. সেটা হচ্ছে যে film is not made. Fimmaking কথাটা বাজে কথা। Film is built. Brick to brick যে-রকম ভাবে একটা বাড়ি তৈরি হয়, film তেমনই shot by shot কেটে-কেটে তৈরি হয়। It is built, it's not made. এই দু'জন ব্যক্তি, তারপর কার্ল ড্রেয়ার। কার্ল ড্রেয়ার-এর ছবি আমি অনেক দিন আগে পুনায় দেখেছিলাম। 'The Passion of Joan of Arc' এই ছবি দেখে আমার মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে গেছল। আর আমাকে গুরুজন বলে মানতে হলে একটু মানতে হয় বুনুয়েল সাহেবকে। লুইস বুনুয়েল। এঁরা ক'জন আমার সত্যিকারের গুরু, plus মিজোগুচি। এঁর 'Ugetsu Monogatari' দেখে আমি staggared. . . মানে. . . মাথা-ফাতা খারাপ হয়ে গেছল। একেই বলে ছবি! ছবি কী, এই ক'টা লোক থেকে আমি পেয়েছি।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি, বলব সেটা? 'Battleship Potemkin'। তার ওপরে ছবি আজ পর্যন্ত হয়নি। তাতে Odessa Steps sequence— তার ওপরে ছবি কেউ কোন দিন করতে পারবে না। কাটা কাকে বলে, মাল. . . ফিল্ম হচ্ছে

কাটার ওপরে। কাঁচি হচ্ছে ফিল্ম, যে, ঠিক ক'টা frame পরে ফেলে দেব। 'Battleship Potemkin'-এর ওপরে কোন ছবি আজ পর্যন্ত জন্মায়নি।

সাধারণ ভাবে বিদেশি ছবি আর এ দেশের ছবির মধ্যে খুব বেশি তফাত আছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু মিজোগুচি-র ছবি, ওজু-র ছবি, তারকোভস্কি-র ছবি কিংবা কাকোয়ানিস-এর ছবি— এগুলো আমাকে পাগল করে তোলে। কার্ল ড্রেয়ার, লিওপোল্ড তোরে নেলসন— এরা আমাকে ক্ষেপিয়ে দেয়। কুরোশাওয়া-র কথা আমি বলতে চাই না। কারণ সে এখন বিক্রি হয়ে গেছে। ইতালিয়ান পরিচালকদের মধ্যে চার জনকে আমি শ্রদ্ধা করি— আন্তনিয়নি, বিশেষ করে ফেলিনি, ভিসকন্তি আর রসেলিনি। কিন্তু বর্তমান জীবিত পরিচালকদের মধ্যে লুইস বুনুয়েল আমার পূজ্য।

রাশা-তে কিছু কাজের লোক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোজিনৎসেভ অমর কাজ করে গেছেন। গ্রিগরি কোজিনৎসেভ। 'Hamlet' ভাবা যায়? আর শেষ আমি দেখেছি আন্দ্রেই তারকোভস্কি, তাঁর 'Ivan's Childhood'— আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। প্রথম দৃশ্যে ঐ মায়ের মুখ, আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। তারপর ক্যামেরার ব্যবহার আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। ঐ যে slow motion, যে judiciously ব্যবহার করা হয়েছে— আমি এত সুন্দর কাজ খুব কম দেখেছি।

আরও অনেক কিছু বলার ছিল, এই অবসরে এতখানি বলা যাবে না। বুনুয়েল সাহেবের 'Viridiana' ছবিতে একটা Last Supper-এর scene-এর ওপরে যে-satire আছে— আমি বাপের জন্মে ভুলব না। সেখানে heroine মেয়েটি কতগুলো rogue-কে নিয়ে এসে supper খাওয়াচ্ছে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত 'Last Supper'-এর framing, হঠাৎ fuse করে দিল। মানুষকে বুঝিয়ে দিল যে entire Roman Catholic dogma is bogus.

This is Bunuel. ওঁর থেকে বড় ছবির শিল্পী আমার মতে কেউ নেই বর্তমানে।

Content প্রথমে আসে। রবীন্দ্রনাথ একটা কথা বলে গিয়েছিলেন যে আগে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তার পরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ। কথাগুলোর মানে আপনারা ভালো করে বুঝে দেখবেন। Form-টা কিছু না, ওটা আকার মাত্র। যেমন তুলনা করতে পারি আন্দ্রে ভাইদা অনেক কষ্ট পেয়ে যে-সব ছবি তুলছে, সেগুলো অভদ্র। মানবজীবনের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার একটা প্রশ্ন আছে। তার থেকে content রূপ গ্রহণ করে এবং form তার নিজস্ব গতি

গ্রহণ করে। কিন্তু এগুলো বাহ্যিক। আসলে দার্শনিকতা। সেইটে আজকাল খুব কম পাওয়া যাচ্ছে। লুইস বুনুয়েল-এর পর মিজোগুচি আজ নেই, ওজু আজ নেই, খালি কুরোশাওয়া করে খাচ্ছে। ফেলিনি বিক্রি হয়ে গেছে। আন্তনিয়নি— সমস্ত ব্যাপারটার গভীরে ঢোকার মতো মানসিকতা তার নেই। বার্গম্যান একটি সম্পূর্ণ জোচ্চোর। কাকোয়ানিস কিছু ভালো চেষ্টা করেছিল 'Electra'-জাতীয় ছবিতে, কিন্তু সে-ও হারিয়ে গেল। ফরাসি Nouvelle Vague এবং তার অনুকরণে পোলিশ বা চেকোশ্লোভাকিয়ান 'নোভাল ভাগ' আমাকে পীড়িত করে। এবং জাঁ-পল সার্ত্র ও আলব্যের কাম্যু-র চিন্তাধারাকে (তারা) গ্রহণ করেছিল, যেগুলো অত্যন্ত infantile, শিশুসুলভ। এর মধ্যে কোন গভীরতা নেই। ছবির জগতে জালিয়াতি শার্লি ক্লার্কও করেছে তার 'Connection' ছবিতে, লিন্ডসে অ্যান্ডারসন-ও করেছে, কিন্তু এরা গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি।

সমস্ত শিল্পই ধ্রুব শিল্প। ফিল্ম যদি সত্যি হয়, তা হলে আইজেনস্টাইন, পুদভকিন, ডি.ডব্লিউ. গ্রিফিথ, প্রথম যুগের চার্লস চ্যাপলিন— এঁরা দাঁড়িয়ে আছেন সত্যিকার প্রচণ্ড শক্তির রূপ ধরে। সেখানে আজকালকার বাঁদরামি আমার কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। অবশ্যি ফেলিনির 'La Dolce Vita', বুনুয়েল-এর সমস্ত কাজ বাদে। এ সম্পর্কে আমার আর কিছু বলার নেই।

চলচ্চিত্রে বাস্তবতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা? তার আগে বলুন শিল্পে বাস্তবতা। ও দুটো জড়াজড়ি করে আছে। সিনেমায় বাস্তবতা একটা আন্দোলনের ফল-শ্রুতি। এ তো জানা কথা উনিশ শতকের শেষদিকে সাহিত্যে এমিল জোলা বাস্তবতার সূত্রপাত ঘটালেন। তথাকথিত রোমান্টিকতার প্রতিক্রিয়া হিশেবে এই ঢেউ এল। আর সেই পরিবর্তন এল মঞ্চে। ১৯০৫ সালে মুক্তি পেল 'The Great Train Robbery.' চলচ্চিত্র যে একটা মহৎ শিল্পমাধ্যম হতে পারে, তার প্রথম প্রকাশ দেখতে পেলাম ডি.ডব্লিউ. গ্রিফিথ-এর, বিশেষ করে 'Intolerance'-এ। হ্যাঁ, বাস্তবতার দিক থেকেও। মাঝামাঝি আর-একটা ধারার সূত্রপাত ঘটালেন জর্জেস মেলিস। তাঁর কাজে fantasy-র প্রাবল্য। চলচ্চিত্রে বাস্তবতাকে সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে যিনি হাজির করলেন, তিনি হলেন classic স্রষ্টা আইজেনস্টাইন। ছবিতে শব্দ এল। তখন যা তৈরি হতে শুরু হল তা না romantic, না realist, না futurism. ব্যাপারটা হল অদ্ভুত। সব মালমশল্লা মিলিয়ে একটা জগাখিচুড়ি। আস্তে-আস্তে তা থেকে এল তথাকথিত বাস্তব-মার্কা ব্যবসায়িক পণ্য। যুদ্ধের সময় মানুষ দেখল ধ্বস্ত পরিপার্শ্ব। সেই সময়

ইতালির মহান স্রষ্টা রসেলিনি, ডি সিকা, জাভাত্তিনি— এঁরা বাস্তববাদী ছবি সার্থক অর্থে তৈরি করতে লাগলেন। তাঁরা এর নাম দিলেন neo-realism. দেখুন মশাই, খোলাখুলি কথা কই, ও-সব neo-ফিও আমি বুঝি না। এর মধ্যে neo কী আছে? যা আছে তা হল শাদামাটা বাস্তবতা। যেমন-যেমন ঘটেছে, তেমন-তেমন দেখিয়ে যাও। জোলা-র যে-naturalism, তাকে আমি বলি photographic realism. কিন্তু realism বলতে আমি বুঝি বাস্তব ঘটনার সমন্বয়ে এমন এক ইঙ্গিত দেওয়া যা. . . উপলব্ধিতে গর্ভবতী। Socialist realism শুধু তা-ই নয়, তার সঙ্গে নির্দেশ করে লক্ষ্য। জনসাধারণকে শ্রেণী-সংগ্রাম সম্পর্কে সচেতন করে। বন্ধ্যা সমাজকে বদলে অগ্রসরমান শক্তির সমর্থনে সংগঠিত করে। অর্থাৎ শেষ বিচারে বাস্তবতা দাঁড়াচ্ছে এই রকম— জীবনের থেকে কাঁচা মাল সংগ্রহ করো, তাকে এমন ভাবে গুছিয়ে নাও যা থেকে সমস্ত ব্যাপারের ওপর একটা 'বক্তব্য' বেরিয়ে আসে। অন্তত আমার তো এই রকমই ধারণা।

আমি আগেই বলেছি বাস্তবতা হচ্ছে শিল্পের একটি বিশেষ ধারণা। এর মানে এই নয় যে বাস্তবতার সঙ্গে মহান শিল্পের সম্পর্ক বৈরিতামূলক। অন্য যে-সব ধারা জন্ম নিচ্ছে, তা-ও সত্যিকারের সিনেমা নামক ব্যাপারটির সতীন নয়। কিন্তু সিনেমার কথা বলতে গেলে আমি বলব— বাস্তবতাই হল সবচেয়ে প্রধান, আগ্রাসী এবং উন্নত ধারা। না, এটা একটা স্বয়ম্ভু ব্যাপার নয়। অন্য সব কিছুর সঙ্গে যোগাযোগবর্জিতও নয়। মনুষ্যচরিত্রে নানা ব্যাপার রয়েছে জানেন। পিকাসো-র নাম জানেন? তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ বাস্তবতার দ্বারা গভীর ভাবে প্রভাবিত। কিন্তু তাকে তিনি যে-চিত্রভাষায় প্রকাশ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বাস্তববাদী নয়। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে পিকাসো-র চিত্র-বাণী ভয়ানক ভাবে বাস্তব। যেমন ধরুন ব্রেশট-এর Epic realism. এ হল absolute expression. সোজাসুজি অন্য একটা স্তরে উন্নীত করে। মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে। সঙ্গে-সঙ্গে তার চেষ্টা দর্শককে একটা বিশেষ মতবাদের শরিক করে তোলা।

১৯২৫ সালে আইজেনস্টাইন-এর 'Strike' ছবি দিয়ে, পরে 'Battleship Potemkin' দিয়ে সোভিয়েত বাস্তবতার সূত্রপাত। জর্মন UFA ধরনের বাস্তবতার জন্ম ১৯২৬/২৭-এ, ফ্রেড সারনাজ, ফ্রিৎজ লাঙ এঁরা আবার নিজস্ব নিরীক্ষা চালান। এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে জি.ডব্লিউ. পাবসট-এর Kameradschaft-এর কথা। সোভিয়েত বাস্তবতার জাত হল বিপ্লবী। ছবিটাই শুধু ওদের মাথা ঘামাবার ব্যাপার নয়। মানুষ সম্পর্কে উদাসীনতা

ওরা বরদাস্ত করে না। সেটা শুধু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। যদি তা শিল্প হয়ে ওঠে, ভালো। মানুষকে জাগাও। স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লড়তে হবে সর্বত্র। এটাই হল সোভিয়েত বাস্তবতার মোদ্দা ব্যাপার। দ্বিতীয় যুদ্ধের সম-সময়ে অথবা পরে মনে করুন রসেলিনি-র 'Paisá' অথবা ডি সিকা-র 'Shoeshine' ছবি-দুটির কথা ভেবে দেখুন। এ হচ্ছে ভিন্ন এক ধারার বাস্তবতা। যুদ্ধবিধ্বস্ত এক দেশের ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ত্রাস এবং দুঃস্বপ্নকে দু'হাতে সরিয়ে মানুষ এক নতুন ভাষা আয়ত্ত করেছে। কিন্তু শিল্প তো স্থবির নয়। তা বয়ে চলে, বয়ে চলে, নিরবধি বয়ে চলে। আজকের বাস্তবতা কিন্তু সেদিনের থেকে আলাদা— বুঝতে পারলেন?

চ্যাপলিন-এর প্রতিভা আমরা তাঁর নির্বাক ছবির মধ্যেই টের পাই, বিশেষত তাঁর স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবিগুলির মধ্যে। আমার মনে হয়, তাঁর মৌন নির্বাক অভিনয় আর নির্বাক চলচ্চিত্রের নির্মাণরীতির মধ্যে একটা গভীর আত্মীয়তা ছিল। ধ্বনি যার পুরো অর্থটাকেই পালটে দেয়, তার প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাধার দেওয়াল তুলে। ঐ সময়টাতে শব্দ-প্রক্ষেপণ ব্যাপারটাও অতি আদিম অবস্থায় ছিল। শব্দগ্রাহক যন্ত্র তখনকার দিনে এত বড় ছিল যে তা অবাঞ্ছিত বিষয়ের মতো সিনেমা তৈরিতে বাধার সৃষ্টি করত। চলচ্চিত্রকারেরা সেদিন বুঝতেই পারেননি কোথায়, কখন, কী ভাবে ধ্বনির ব্যবহার করা উচিত। চ্যাপলিন চাইতেন না তাঁর ছবিতে এই ধ্বনির কোন প্রভাব থাকুক। তিনি নির্বাক ছবির অনুকূল চরিত্রের গতি, হাবভাব, মূকাভিনয়-সুলভ অভি-ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তা ছাড়া তিনি বিশুদ্ধতাবাদী শিল্পী ছিলেন। 'City Lights' ছবিতে তিনি প্রথম শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাতেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়েননি। এ ছবির গল্পে তিনি এক ভব-ঘুরে ফুটপাথবাসীর চরিত্রে অভিনয় করেন, ঘটনাচক্রে যার সঙ্গে এক Mill-মালিকের বন্ধুত্ব হয়। এক রাতে পানশালায় Mill-মালিকের সঙ্গে মদ্যপান করার সময় তাঁর গলা দিয়ে শিসের আওয়াজ বেরতে গিয়ে আটকে যায়। হেঁচকি তুলতে গিয়ে সেই আওয়াজ বেরিয়ে আসে। 'City Lights'-এ চ্যাপলিন নিজেই শিসের শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন। এর পর থেকেই তিনি সবাক ছবি করা শুরু করেন।

গোদার মূলত একজন চলচ্চিত্রকার। তাই তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ হল ছবি করা। রাজনীতি করার ভার উনি অন্যদের ওপর ছেড়ে দেন। ভাবুন, যদি গর্কি 'মা' না-লিখে সাংবাদিকতাকেই নিজের পেশা হিশেবে গ্রহণ করতেন তো

কী হত? আমি সাংবাদিকতা, শ্লোগান দেওয়া বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে নিন্দা করছি না, কেবল এ কথাই বলতে চাইছি যে শিল্প যা পারে তা একমাত্র শিল্পেই সম্ভব।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো (এখন) ফরাসি চালিয়াতির অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছে। এটাকে আমি গভীর ভাবে ঘৃণা করি। তাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে এই সব ছবির কোন মিল নেই। রাশিয়ান ছবিগুলো, দু'এক জন director-এর ছাড়া, সম্পূর্ণ গাধার মতো। সেগুলো নিয়ে কোন গভীর আলোচনার অবকাশ নেই। ভিয়েতনামের ছবি আমি দেখিনি, কিউবার ছবি দেখিনি, চিন-এর ছবি আমি দেখিনি— সুতরাং এই সব দেশের ছবি সম্বন্ধে কোন কথা বলার আমার অধিকার নেই। তারা যদি ভদ্রলোকের মতো ছবি করে থাকে, তা হলে ধন্যবাদ। আমি ও-বিষয়ে কোন কথা বলার অধিকারী নই।

এ কথা ঠিক যে সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ছবি করার ধারা পালটে যায়। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শিল্পীর ব্যক্তিসত্তা। এক-এক জন মানুষ এক-এক ভাবে জগৎকে দেখে এবং তার ভিত্তিতে শিল্প সৃষ্টি করে। সেখানে নামকরণে যতই আত্মতৃপ্তি পাওয়া যাক, জিনিশটা এত সোজা নয়। পাসোলিনি এখন যা করে যাচ্ছেন সেটার নাম neo-realism-ই দিতে হয়, যদি কিছু দেওয়ার থাকে। ভবিষ্যতে যদি কোন মহৎ শিল্পী আসেন এবং তিনি যদি তথাকথিত neo-realism পদ্ধতিতে ছবি করেন, তা হলে তখন মানতেই হবে যে ও-জিনিশটার আয়ু ফুরোয়নি। আসলে এ ভাবে বাঁধা-ধরা গণ্ডির মধ্যে শিল্পকে আবদ্ধ করাতে কোন লাভ নেই। চিরকাল শিল্পীরা এগুলোকে ভেঙে দিয়েছেন— শিল্পের সমগ্র ইতিহাস এর প্রমাণ।

Label-গুলো label-ই। ওগুলো কোন কাজেরই না। প্রত্যেকেই তার নিজস্ব পথে চলেছে। আর ঐ ফরাসি New Wave আমি একেবারেই পছন্দ করি না। ওটা একটা stunt আমার মতে।

'Four hundred blows', ওটা New Wave-ই না। তবে খুব ভালো ছবি। আর 'Breathless' আমি দেখিনি। ওদের যেটা দারুণ New Wave, রেনে-র 'Last year at Marianbad', ওটা একেবারেই completely existentialist ছবি। New Wave-টা কী? Labeling-র ব্যাপারগুলো কাটো তোমরা পথের থেকে। তোমরা নতুন করে ছবি ভালোবাসতে এসছো। এই label-গুলো হচ্ছে অত্যন্ত false critic-দের তৈরি। Labeling বলে কিছু নেই। একটা

অবস্থা থেকে— একটা পটভূমি থেকে এখন তোমাদের ঢাকায় নতুন ছবি শুরু হবে। তোমাদের এখানকার শিল্পীরা পৃথিবীর ছবি দেখে তার থেকে influenced হবে যেমন, তেমনই এ দেশে ইতিহাসের যে-পটভূমি, তাদের suffering, sorrow-র যে-পটভূমি— তা থাকতে বাধ্য। তার থেকে নাম, label করার দরকারটা কী? এক-এক জন এক-এক দিক থেকে করবে। I don't believe in names.

গোদার কি New Wave নাকি? Godard is an utter Communist film-maker. এবং একেবারেই bold. He believes in street-fight from the street— এই তো বক্তব্য তাঁর। সে New Wave মোটেই না। আর সে-ও বদলাচ্ছে তো। তার last statement-গুলো কী? ত্রুফো-র সাথে গোদার-এর কোথায় মিল? অ্যালাঁ রেনে-র সাথে রব গ্রি-এর কোথায় মিল?

Form-টর্ম কিছু ব্যাপার না। ব্যাপার হচ্ছে content approach. তার থেকে expression-টা আসে, form-টা শুধু expression-এর জন্য। যেমন গোদার completely একজন working communist. সে ভেবেছিল গল্পের কোন value নেই। এই ছিল তার stand, এখন সে বলছে যে না, গল্পের দরকার আছে। এখন he has changed. লোকে অভিজ্ঞতা থেকে, নিজের ছবি দেখে, পৃথিবী দেখে, তাঁর ছবি থেকে অন্যের reaction দেখে আস্তে-আস্তে বদলায়। যে-আমি 'অযান্ত্রিক' করেছিলাম, সে আমি কি আছি? সত্যজিৎবাবুর 'সীমাবদ্ধ'র সাথে 'পথের পাঁচালী'র কী মিল? 'অশনি সংকেতে'র সাথে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটা shot-ফটে মিল থাকতে পারে, আর কী মিল?

মৃণালবাবু এক দিক দিয়ে এসেছেন, সত্যজিৎবাবু এক দিক থেকে এসেছেন আর আমি এক দিক দিয়ে এসেছি। এটা কোন একটা আন্দোলন— সংঘবদ্ধ আন্দোলন থেকে আসেনি। যেমন সত্যজিৎবাবু ছবি সম্বন্ধে প্রচুর পড়াশোনা করতেন। রেনোয়া সাহেব যখন এলেন ছবি করতে, তখন তাঁর সঙ্গে থেকে তিনি highly influenced হলেন। রেনোয়া-ই তাঁর গুরু। তিনি নিজেও এটা স্বীকার করেন, neo-realism-টা তার পরে। আমি সম্পূর্ণ রূপে আইজেনস্টাইন-এর বই পড়ে influenced হয়ে ছবিতে আসি। ১৯৫২-তে film festival-এ যে neo-realistic ছবিগুলো দেখানো হয়েছিল সেগুলো আমাদের definitely খুব মোহিত করেছিল, কিন্তু কাকে influence করেছিল আমি ঠিক বলতে পারি না। কেননা সত্যজিৎবাবুর ছবি, রেনোয়া সাহেবের lyricism এবং ফ্ল্যাহার্টি-র lyricism ও nature love, এই থেকে তার আরম্ভ।

আমার ছবি কারও কাছেই বোধ হয় না। যদি থাকে, আইজেনস্টাইন-এর কাছে আছে। কেননা neo-realistic ছবি আমার 'অযান্ত্রিক' একদমই না। 'নাগরিক'ও না। 'অযান্ত্রিক' completely একটা fantastic realism. একটা car, একটা গাড়ি without any trick shot. ওটাকে animate করা হয়েছে। She is the heroine, আর ড্রাইভার হচ্ছে hero. Whole গল্পটা একটা ড্রাইভার আর তার গাড়ি। আর কিছু নেই। এটার সঙ্গে neo-realism-এর সম্পর্ক কী? ওটাকে সম্পূর্ণ রূপে fantastic realism বলা যেতে পারে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই দেখেছি এবং সে সময় ওটা খুব powerful ছিল। এবং নিশ্চয়ই আমাদের প্রত্যেকের ভালো লেগেছিল। Unconsciously হয়তো খানিকটা— সে সারা পৃথিবীর ছবি দেখলেই হয়ে থাকে, যেমন জাপানি ছবি দেখেও হয়েছে।

(বার্গম্যান-কে) জোচ্চোর বলেছি। বার্গম্যান সম্পর্কে বলতে গেলে অনেক কিছুই বলতে হয়। বার্গম্যান-এর দু'একটা ছবি ছাড়া আর সব ছবিই মধ্য যুগ, আদি মধ্য যুগ, Crusade-এর period এবং তারও আগের period, এগুলো নিয়েই সৃজিত হয়েছে। কেন হয়েছে? তার কারণ হচ্ছে যে সুইডেন হচ্ছে one of the last countries to be Christianized. সুইডেন বিশেষ করে whole স্ক্যান্ডেনিভিয়া-তে Viking philosophy, যেমন সারাজ, হামহালা ইত্যাদি একটা খুব vigorous ব্যাপার ছিল। তার সঙ্গে লড়াই করে ঢুকতে হয়েছে Christianity-কে। এখনও সেই conflict-টাকে althrough refer back করে continuously, যেমন, 'Virgin Spring', Virgin Spring-টা কী? আসল ব্যাপারটা হচ্ছে একটা church স্থাপন করে তার পিছনে একটা মিথ্যা গপ্পো তৈরি না-করলে তো আর লোককে টানা যায় না। সেই জন্যই গপ্পো ফাঁদা হয়েছে যে একটা বাচ্চা মেয়ে raped হয়েছিল, but she was so innocent যে সেখানে একটা spring grow করল এবং সেখানে বিরাট একটা cathedral তৈরি শুরু হল। এখন এর পেছনে একটা গুল তৈরি করতে না-পারলে তো পুরুতদের জমবে না। সেই জন্যই একটা গুল তৈরি করা— সে মেয়ে হ্যানত্যান— আসলে কিছুই না। আসলে হচ্ছে যে একটা emotional surcharge না-করে তো আর Pagan philosophy-কে আনা যাবে না। লোকের মধ্যে ঐ জায়গায় একটা পির, ওখানে একটা দরবেশ, এখানে একটা গুরুদেব, এই সমস্ত বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে— উনি ছিলেন সেখানে, কাজেই এটা হয়েছে। এই যে গুল— এগুলো কী? What is this 'Senveth Seal'? Terrific জোচ্চোর বলেছি এই জন্য— জোচ্চোর

তো আর যাকে-তাকে বলা যায় না। জোচ্চোর কাকে বলবে?— One of the supreme brains, one of the supreme technicians, যে জেনে-শুনে বদমায়েশি করছে। গাধাদের কাছ থেকে তো এটা আশা করা যায় না— যে জোচ্চুরি করতেই জানে না। If he does not know the truth he cannot cheat. So knowing fully well he is cheating. Do you follow me? সেই জন্যই তাকে জোচ্চোর বলেছি।

(কিন্তু 'Soul') টেরিফিক ছবি। শুধু 'Soul' কেন, 'The Face'-ও terrific ছবি। শেষটায় আমার মনে হয় যেন ego থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা আজকের agony-কে ধরার চেষ্টা আছে। 'Silence'-ও তা-ই। তাই বলছি যে series of films, যেমন 'Winter Light', 'Wild Strawberries'-এ Christian philosphy-র সেই ডাক্তার— সেই stigmator-এর চিহ্ন, Cross-এর চিহ্ন, symbol, সমস্ত কিছু Biblical. এই জিনিশগুলোকে I don't like.

এখানে social consciousness কোথায়? 7th century-8th century-র সুইডেনের সাথে আজকের সুইডেনের কোন সম্পর্ক আছে? Social consciousness-এর মানে কী? একবার করলাম— সেটা একটা কথা। তা করছে তো। পাসোলিনি করেনি? 'Gospel according to St. Mathew' সম্পূর্ণ Biblical, কিন্তু কী terrific ভাবে সেটা আজকের context-এ টেনেছে। কাজানজাকিস, কাকোয়ানিস এরাও তো Christian myth-গুলো নিয়েই ছবি করেছেন এবং আজকের context-এ টেনে। কিন্তু ও ব্যাটা শুধু পেছনের দিকে নিয়ে যাবারই চেষ্টা করেছে। এঁরা ঐতিহ্যটাকে টেনে আজকের দিনের সঙ্গে তার মানে তৈরি করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এ ভদ্রলোক চেষ্টা করেছেন আমাদের পিছনমুখী করতে। একই জিনিশ— ওটা আমি কেন করব না। আমি করতে পারি— আমিও কি রামায়ণ-মহাভারতের গল্প করতে পারি না? করা মানে, আমি কি করব ওটাকে ওখানে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে? মোটেই না, ওখান থেকে টেনে, আমাদের ঐতিহ্যের অংশ, আমাদের দেশের, কাজেই তাকে আমার টানার সমস্ত অধিকার আছে। এদের সবাইকে আমি দেখিয়েছি আমার ছবিতে। আমি দেখাচ্ছি যে এই হচ্ছে ছবিটুকু।

আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হাজার বছর ধরে আমার চাষি বসে আছে। আর তোমরা নেচে-কুঁদে যাচ্ছ। সক্কলে নচ্ছার। ছবি আরম্ভ হচ্ছে এক বুড়োকে দিয়ে। আর কিছু নেই। শেষও হয়েছে সেই বুড়োকে দিয়ে। বুড়ো বসেই আছে। সে কাশছে। কী করবে? আর দাদারা সব করে যাচ্ছে। বাক্‌তাল্লা বাজিয়ে বড়-বড় কথা, হ্যানত্যান। সকলেই দেশের মুক্তি আন্দোলন পকেটে

করে বসে আছে। কী করে মুক্তি আসবে? কী করে সব কিছু হবে? সক্কলে জানে— সব ডাক্তার। সব গদির জন্য দৌড়োদৌড়ি করছে। এই তো বক্তব্য আমার। আমি এটা as a common citizen of India, who has gone through all these things, এর point of view থেকে দেখেছি। No political issues. আমার universal গালাগালি। সেটা হল এই জন্য যে ওরা আমাদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আমি জানিনে solution, আমার কাছে theory নেই।

সুইডেনের definitely অধিকার আছে করার। Crusade, প্রথম Christianity-র advent, pagan philosophy, এগুলো সম্পূর্ণ ওর সম্পত্তি। কিন্তু সে সম্পত্তিটাকে তুমি কী ভাবে ব্যবহার করছ? যেহেতু সে extremely powerful— one of the greatest filmmaker of the world, সে জন্যই ও-কথা বলা হয়েছে। একটা হেজিপেঁজি, টম-ডিক-হ্যারিকে তো আর কেউ জোচ্চোর বলবে না! That fellow doesn't know, বুঝেছ?

শিল্প হল চলমান। পুরনো ফেলিনি আর আজকের ফেলিনি এক নন। তিনি বেড়েছেন, বড় হয়েছেন, আরও বড়. . .। অভিজ্ঞতা কুড়িয়েছেন। ছবি করেছেন। বেশি করে ভেবেছেন, পড়েছেন, মিশেছেন। সুতরাং 'Last Brother' আর 'Eight and half'-এর ফেলিনি এক নন। হুম, যদি কোন শিল্পী একই জিনিশ অনবরত দিয়ে যান, তবে বুঝতে হবে সে ভদ্দরলোকের ভিতরটা পচে গিয়েছে। তার বাড় বন্ধ হয়ে গেছে। আন্তনিয়নি-র ব্যাপারেও সেই। তবে ফেলিনি-র সাথে ওঁর একটা তফাত রয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে ফেলিনি সম্পূর্ণ committed. কিন্তু তাঁকে label মারা যায় না। তিনি সমাজের বড়-বড় ব্যাপার সম্পর্কে আগ্রহী। তাঁর চরিত্রগুলো বিভিন্ন type-এর মানুষের প্রতিফলন। আন্তনিয়নি-র বেলাতে সেটা সত্য হলেও তিনি কম-বেশি মানবিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত।. . . এঁদের দু'জনেই মহৎ শিল্পী।

Nouvelle Vague বলে কিছু নেই। আসলে সমালোচকেরা একটা নাম দিতে ভালোবাসে। Cahiers du Cinema-র ছেলেরা সম্পূর্ণ আলাদা। এঁদের প্রত্যেকেই নিজস্ব সময়ের ঝোঁক সম্পর্কে নিরাসক্ত। তবে সকলেই প্রখর স্বাতন্ত্র্যবাদী। এই যে কালহরণ, আসা-যাওয়া, এই সব তো সাহিত্যে অনেক আগেই জেমস জয়েস এনেছেন— 'Ulysses'. আমি একটা বিষয় গ্রহণ করলাম। আমি কিছু বলতে চাই। দরকার একটা অস্ত্র। আমি যদি মনে করি 'Hiroshima Mon Amour'-এর form-এ আমার বক্তব্য বিষয় সবচেয়ে ভালো প্রকাশ করতে পারব, তবে তা-ই করব। কিন্তু শুধু একেই নব তরঙ্গ

বলে না। আজ গোদার যে-ভাবে দেখতে চাইছেন, ব্রেশট বহু আগেই সে ভাবে দেখেছেন। গোদার তাঁর ক্যামেরায় এক ছোকরাকে তার প্রিয়তমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে দেখালেন, তারপরই দেখালেন studio-র light. ভাবখানা, চুলোয় যাক ! আমি তোমাদের প্রমোদ বিতরণ করতে বসিনি। এগুলো নকল, চোখ-ভোলানো। দ্যাখো, মন্তব্য করো। ব্রেশট তো ঠিক এটাই করেছেন। সবাই আলাদা, কিন্তু স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সকলেই এক মঞ্চে। এ ভাবে কেউ জাঁ-পল সার্ত্র-এর, কেউ বা মার্কস-এর দ্বারা প্রভাবিত হন, কেউ হন না।

চলচ্চিত্রের প্রাচীন এবং আধুনিক পদ্ধতি বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন, আমি ঠিক বুঝলাম না।

পদ্ধতি-টদ্ধতি বুঝি না মশাই, আমার কাছে আজও প্রমথেশ বড়ুয়া ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিত্রপরিচালক। আমরা কেউই তাঁর পায়ের নখের যোগ্য নই। আমার আজও মনে পড়ে 'গৃহদাহে'র সেই অসম্ভব transition : সেই যে high heel জুতো-পরা দুটো পা থেকে সোজা কেটে দুটো আলতা-মাখা পা পালকি থেকে নামছে— আমি কখনও ভুলব না। এবং ব্যাপারটা ভদ্রলোক করেছিলেন ১৯৩৬ সালে— এ কথা ভুলবেন না। আর সেই যে সেই 'উত্তরায়ণে' বড়ুয়া-সাহেবের জ্বর হওয়ার পরে ক্যামেরা সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে আছড়ে পড়ল— সেটাই কি ভোলা যায়! এবং কাণ্ডটা ঘটিয়েছেন ভদ্রলোক ডেভিড লিন-এর 'Oliver Twist'-এর বহু আগে। Subjective camera সম্পর্কে অনেক কথা আজকাল শুনতে পাই, বিভিন্ন পরিচালক নাকি খুব ভালো ভাবে ব্যবহার করছেন। তাঁরা মহারাজ প্রভাত কুমার বড়ুয়ার ছেলের কাছ থেকে কিছুটা শিখতে পারতেন, তাঁর পায়ের তলায় বসে।

কাজেই ব্যাপারটা মোটামুটি মশাই, আমার কাছে গুলিয়ে গেছে— প্রাচীন আর আধুনিক বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন। এ সব ধরনের কথা শুনলে আমার একটা কথাই মনে হয়— কাজি নজরুল ইসলামের ভাষায় 'দে গরুর গা ধুইয়ে—'।

Technical side-টা কী মশায়। Film is not made, film is built. আমি চিত্রপরিচালক নই, আমি চিত্রস্রষ্টা। চিত্র সৃষ্টি করে একজন— সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন চিত্র সৃষ্টি করে, তাঁরা (নিছক) চিত্রপরিচালক নন। অত্যন্ত ভুল এবং বাজে কথা আপনারা লেখেন। একজন সৃষ্টি করেন, প্রণয়ন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শকুন্তলা প্রণয়ন করেছিলেন, তিনি শুধু (তার) লেখক নন।

Technique-এর নিজস্বতা নেই। আমরা মায়ের পেট থেকে পড়ি, তখন ভাষাজ্ঞান নেই। বয়স বাড়লে ভাষা শিখি। কেন? আমাদের ভাবকে প্রকাশের জন্যে। ভাষার দাম নেই, তার দাম প্রকাশিত ভাব, ভালোবাসা ও ক্রোধে। ভাষা শেখা সে সবকে তীব্র ভাবে প্রকাশ করার জন্যে।

সিনেমায়ও ব্যাপারটা তাই। যন্ত্রপাতি নিয়ে চলতে হয়, তাই শিখতে হয়। Technique-সর্বস্বরা জোচ্চোর। আমি ওর মধ্যে নেই। আমি একটা কথা বলতে চাই— technique আপনা-আপনি আসে। আগের ছবিতে কী technique করেছি তা এখন আমার মাথায় নেই। পরে (এ বিষয়ে) বলাটা intellectual ফাজলামি।

Film is no mystery. এটা একটা ডাল-ভাত। একটা ভোর দেখছি। কী lense দরকার, তা কি অঙ্ক কষে দেখি? মনে করি ভালো হবে, তা-ই। হয়তো ভালো হবে, হয়তো নয়।

ফিল্মের কাগজগুলো গেড়েমিতে ভর্তি। পড়তে পারি না। আসলে ছবি করার সময় অন্য কোন শক্তি ঢোকে। তার প্রথমে থাকে আবেগ, আবেগই চালিত করে। সমস্ত ব্যাপারটা আবেগ থেকে আসে। যার আছে তার আছে, যার নেই তার নেই। এ হল ভেতর থেকে উৎসারিত। যে-কোন শিল্পকর্ম সম্পর্কে এ কথা খাটে। লোকে গ্রহণ করুক অথবা না-করুক। যে-দিন দর্শকরা screen ছিঁড়ে দিল, সে দিন থেকে চুল পাকতে শুরু হল।

শিল্পী কি গাড়ি, রেডিওগ্রাম, বৌ-এর গয়নার জন্য ছবি করবে? সবচেয়ে বড় কথা চেষ্টা করা। হবে কি না জানি না। I can never say I shall succeed.

(চিত্রনাট্য ও নাটকের মধ্যে) পার্থক্য অনেক। মূলত মাধ্যমের বি-সমতাই এই পার্থক্যগুলির জন্ম দিয়েছে। মঞ্চকে কোন সময়েই তার মঞ্চত্ব অর্থাৎ staginess ঢাকার চেষ্টা করতে হয় না, চেষ্টা করেও খুব ফল হয় না। কিন্তু একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবের অনুভূতি (feeling of spontaneity) ছায়াছবি গোড়া থেকেই দর্শকের মনে এনে দেয়।

এই মূলগত পার্থক্য থেকে জন্ম নিয়েছে কী-হয় কী-হয় ভাব কাটানোর চেষ্টা অর্থাৎ avoidance of intrigue, তথাকথিত de-dramatization এবং গল্পাশ্রয়ী নয় এমন ছবির অতি-আধুনিক অনুশীলন। এ সমস্ত ছবি-করিয়েদের মাথায় আসছে গোড়ার ঐ মাধ্যমগত সুযোগ এবং বাধা থেকে। বাধাটা হচ্ছে

এই যে এই স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে নাটুকে ছবি ভেজাল বলে মনে হয়। অর্থাৎ satge-managed.

প্রকৃতি এবং শৈলী— এ দুটোই অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। আর বিভিন্ন দিকের মধ্যে না-গিয়ে আমার যেটা মনে হয়েছে একেবারে গোড়ার কথা, সেটাই ছোট্ট করে বলার চেষ্টা করব।

অবশ্য নাটকও আজকে ব্রেশট-এর হাতে পড়ে একটা মহাকাব্যিক পথ ধরেছে। তার মধ্যে পশ্চিমি ঐতিহ্যের সঙ্গে অপূর্ব সমন্বয়ে এসে মিলেছে চিনা, জাপানি আর ভারতীয় জীবন্ত শিল্পগুলির তীব্র প্রভাব। তাই ব্রেশট অনেক এগিয়ে এসে ছায়াছবির বহু সুবিধেকে অঙ্গীভূত করে নিতে পেরেছেন। অথচ ছায়াছবির যেটা প্রধান দোষ— পল ভালেরি-র ভাষায় ছায়াছবি শুধু বাস্তবের ওপরের আস্তরণটাকেই আঁচড়াতে পারে— সেটা ব্রেশট সম্পূর্ণ বর্জন করতে পেরেছেন। ভালেরি-র সমালোচনার মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। ছায়াছবি সত্যই গভীর দার্শনিক উপলব্ধির প্রকাশকে কতখানি ধরতে পারে, সে বিষয়ে চিন্তার অবকাশ আছে। একটা জায়গায় গিয়ে খেলো হয়ে যাবার একটা ব্যাপার ঘটে, এটা আমার মনে হয়েছে। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতে তা ঘটে না, শ্রেষ্ঠ আঁকা ছবিতে তা ঘটে না, শ্রেষ্ঠ নাটকেও তা ঘটে না।

কথাটাকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে, জানি। সমস্ত ব্যাপারটাকে গুছিয়ে বলতে গেলে অনেক লম্বা হয়ে পড়ার ভয় আছে। আমি মোটেই ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছি না এমন ধরনের কোন কথা— পিরানদেল্লো-র কর্মকাণ্ডের পর 'Roshomon' কোন নতুন খবর নিয়ে আসেনি। আমার বক্তব্য, যে-কোন শিল্পকর্ম, যেটিকে বহুর সঙ্গে বহুর মধ্যে বসে উপভোগ করতে হয়, তার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাবনার কিছু-কিছু দ্যোতনা সঞ্চারিত করে দেওয়া বড়ই কঠিন। নাটকও বহু লোক একসঙ্গে বসে উপভোগ করে বটে, কিন্তু নাট্যকার জানেন তাঁর লেখার মঞ্চের বাইরেও একটা মূল্য আছে। এবং সব শ্রেষ্ঠ নাটকেরই সম্পূর্ণ রসাস্বাদনে একা বসে পড়াও একটা বিরাট অংশগ্রহণ করে। কাজেই নাট্যকার তাঁর চিন্তায় এ সম্ভাবনাকে ধরে নিয়ে এগোন। চিত্রনাট্যকার ঐ রকম কোন কল্পনা করার অবকাশ পান না।

আর-একটা কথাও আমি ভেবে দেখতে বলি। নাটক সম্পূর্ণ জাতীয়। দেশজ ভাষাই তার বাহন। কিন্তু চিত্রনাট্য একটা উৎকট দ্বন্দ্বে সব সময় ভোগে। দেশজ পটভূমি ও ভাষা তার উপজীব্য হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে ছড়িয়ে আছে। ফলে গভীরতম কথা বলতে হলে একটা ধারাবাহিক culture complex-এর ওপর দাঁড়িয়ে আপনাকে বলতে হবে। সেই context

যাঁদের কাছে নেই তাঁরা কত দূর উপভোগ করবেন, এই আশঙ্কায় অনেক সময় চিত্রনাট্যকারকে শস্তায় কিস্তিমাতের দিকে এগোতে হয়। সারা ভারতবর্ষের সৃষ্টিশীল চিন্তায় কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জটি যে-স্থান অধিকার করে আছে, বিভূতিবাবুর সমস্ত লেখাতে এই কালপুরুষ যে-ভাবে বারে-বারে এসে ধাক্কা দেয়, এই symbol থেকে যে-তীব্র তেজ এবং ঘরছাড়া বেদুইনের দৃষ্টিভঙ্গি বিভূতিবাবু আহরণ করেছিলেন, সত্যজিতের 'অপরাজিত'র বিদেশি দর্শকদের মধ্যে ক'জন Orion কথাটা শুনে সেই ভাবে মেতে উঠেছিলেন?

চিত্রনাট্যের নিজস্ব কোন জীবন নেই। চিত্রনাট্যকে বাঁচতে হলে ছবির মধ্যে দিয়ে বাঁচতে হবে। আমি বিশ্বাস করি না যে চিত্রনাট্যকে নিয়ে সাহিত্যের জগতে ঢোকা যায়। চিত্রনাট্য আলাদা, সাহিত্য আলাদা।

'সার্থক সাহিত্য' কথাটার একটু ব্যাখ্যা দরকার। সার্থকটা হওয়া দরকার যে ছবি করছে তাঁর কাছে। মূল সাহিত্যিক কল্পনার প্রেরণা নিয়ে ছবি-করিয়েদের নতুন ছবির কল্পনায়, স্বপ্নে ডুবতে হয়। কাজেই তাঁর কাছে যেটা valid, তাই-ই হচ্ছে সার্থক সাহিত্য— অন্তত আমাদের এই আলোচনার পক্ষে।

আমার মনে হয়, এ কাজে সার্থক সাহিত্য দু'রকমের হতে পারে। এক হচ্ছে, যে-সাহিত্যের জীবনদর্শনের সঙ্গে চিত্রনাট্যকার সম্পূর্ণ একমত। আর দুই হচ্ছে, ভূয়োদর্শন আংশিক সমালোচনা জাগায়।

দ্বিতীয়টির উদাহরণ হিশেবে ধরা যেতে পারে আইজেনস্টাইন-এর 'An American Tragedy'র প্রস্তাবিত চিত্রনাট্যকে। ড্রেইজার-এর সমস্ত বক্তব্যের মূল যেটি, আইজেনস্টাইন তার একটা বিরাট অংশের সঙ্গে একমত ছিলেন। ফলে উপন্যাসের বীজ-ঘটনা যেটি, তার দ্যোতনা এবং তাৎপর্যকে তিনি বদলে নিলেন। এ ঘটনাটি চিত্ররসিক মাত্রেরই জানা আছে।

কিন্তু সেটি তিনি করলেন না। ড্রেইজার-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝে, ড্রেইজার যে-জীবনখণ্ডটি তুলে ধরেছিলেন স্বাধীন ভাবে নিজে তার তথ্যের মধ্যে আবার ডুবে গিয়ে, ড্রেইজার-এর সীমার পরিধিটা উপলব্ধি করে, তবেই তিনি আর-এক ধাপ এগোবার জন্য স্পষ্ট দিকনির্ণয় করেছিলেন। ফলে ড্রেইজার নিজে তাঁর এই প্রস্তাবিত চিত্রনাট্যে এত বদল করা সত্ত্বেও উৎসাহিত বোধ করেছিলেন।

এই হচ্ছে এক ধরনের সমস্যা। এখানে গোটাকে গ্রহণের প্রশ্ন আসেই না। 'পথের পাঁচালী' এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর-এক ধরনের যে-গ্রহণ সে হচ্ছে সম্পূর্ণ গ্রহণ। সেখানে সমস্যা খাঁটি সমস্যা। যেমন ধরুন,

পুদভকিন গর্কি-র 'Mother' করলেন। দু'জন শিল্পীর আত্মিক যোগাযোগ ছিল অখণ্ড।

সেখানেও বদল করতে হয়েছে। যেমন সেই বিখ্যাত দৃশ্য : পাভেল জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফেরার পথে উদার শস্যক্ষেত্রের মধ্যে মায়ের সঙ্গে এসে মিলল। গর্কি-র বইতে এ দৃশ্যটি এবং ঘটনাটি এই ভাবে এই জায়গায় ছিলই না। কিন্তু গর্কি-কে এই দৃশ্যটি উচ্ছ্বসিত করে তুলেছিল।

সমস্যাটা এখানে এই, নির্যাসটিকে গ্রহণ করে আসল বক্তব্যটিকে মাথায় রেখে ভেঙেচুরে নতুন করে সাজাতে হবেই। এ প্রয়োজনটা পড়ে প্রাথমিক শিল্পী অর্থাৎ সাহিত্যিকের vision-টিকে ছবির জগতে সৃষ্টিশীল interpetation-এর মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করার জন্যে। অনেক সময় এই ভাঙাচোরার কাজে কিম্ভুতকিমাকার হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ঝুঁকিটা না নিলেও নয়।

আসলে ঘটনাটা নির্ভর করে চিত্রপরিচালকের) শিক্ষার ওপর, তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভার ওপর। তিনি যদি জানেন যে কোথায় তাঁর স্থান, তিনি কী বলতে চান এবং কী ভাবে সেটা বলতে হবে, তা হলে যে-কোন সাহিত্য তার আংশিক বা সম্পূর্ণ সার্থক মূল্য নিয়ে সঠিক ভাবে প্রতিভাত হবে তাঁর কাছে। তিনি স্থির করতে পারবেন কী গ্রহণীয় কী বর্জনীয়, কী ভাবে accentuate করতে হবে, কী ভাবে plastic image-এর মধ্য দিয়ে বলতে হবে এবং কী ভাবে telescope করতে হবে।

একখানি ছবি দেখে যেন বুঝতে পারা যায়, ভদ্রলোক সাহিত্যকর্মটিকে পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, তার একটা চটকদার অংশে মোহিত হয়ে ছবি করতে ঝাঁপ দেননি। তখনই মনে হয় নজরুলের ভাষায়, 'দে গরুর গা ধুইয়ে'।

সার্থক সাহিত্য তো দেশে খুব বেশি হয়নি। তবে যেটুকু হয়েছে সেগুলোকে শিল্পায়ন করতে গেলে একটা জিনিশ মাথায় রাখতে হয় যে সাহিত্য একটা art আর ফিল্ম আর-একটা শিল্প। কাজেই সাহিত্যকে ফিল্মে রূপায়ণ করতে গেলে তখন ঐ সাহিত্যকে একেবারে বোবার মতো. . . যা এরা করে, মানে লোকজনে করে. . . এটা ঠিক না। কথা হচ্ছে যে ছবি হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে দ্রষ্টব্য। এটা হচ্ছে দৃশ্যকাব্য। এই কথাটা মনে রাখার একটা প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয় হচ্ছে যে এটা শ্রাব্যকাব্য। হ্যাঁ, কথা শোনার একটা ব্যাপার আছে। তার দ্বারা একটা এগুনোর প্রশ্ন ঘটে। এখন সাহিত্য হচ্ছে পড়ার। একটা সুন্দরতম সাহিত্য পড়লে. . . পড়তে গিয়ে একটা আনন্দ, একটা রুচিবোধ,

একটা ঘটনা জন্মায়। কিন্তু film is a performing art. এখানে চোখে দেখার একটা ব্যাপার আছে, কানে শোনার ব্যাপার আছে। এই দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত আছে। কাজেই করতে গেলে বদল করতেই হয়। তাতে যদি সাহিত্যিকেরা চটে যান— তাতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে তাঁরা নিশ্চয়ই বোঝবার চেষ্টা করবেন যে, একটা medium থেকে আর-একটা medium-এ translate করতে গেলে খানিকটা ঘটনা ঘটাতেই হয়।

লোককে জোর করে তো কিছু করানো যায় না। (চলচ্চিত্রে) সাহিত্যিক-দের অনীহার কারণ হচ্ছে সাহিত্যিকরা চোখের সামনে যা দেখছেন তার ভিত্তিতেই হবে অনেকটা, কাজেই তারা যখন দেখবেন কিছু ছেলেপেলে serious চেষ্টা করছে, পারুক আর না-পারুক, সবাই যে successful হবে এমন তো নয়, কিছু attempt হচ্ছে, তখন automatically সাহিত্যিকরা বুঝবে যে জিনিশটা serious. এখন বললে তাঁরা বলবেন যে, এখানে যা হয় তাতে আমরা কী বলব, ভালো একটা গল্প দেব, কেউ নেবে না। তাই তো এখন সত্যি-সত্যি ঘটনা। আমরা করবটা কী ভাবে? How to help and why to get interested? তাদের সবাইকে interested করতে গেলে এখান থেকে একটা force আসা উচিত। তা হলে automatically তাদের মনের মধ্যে আগ্রহ আসবে। আগ্রহ এলেই interested হবে। এবং তখন তারা সেই দিকে লেখার কথা ভাববেন। Filmic story কাকে বলে এটা নিয়ে চিন্তা করবেন। যাঁরা তোমাদের এখানে sincere লেখক আছেন তাঁরা এটা করবেন। কিন্তু এখন how do you expect serious people to be interested?

শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে যেটি একমাত্র প্রয়োজন, সেটি সব সময় সর্ব ক্ষেত্রে হচ্ছে নিজের বলার কথাটিকে সোচ্চারে প্রকাশ করার প্রয়োজন। এবং যখন আর কোন অতীত শিল্পকর্ম, তা সে সাহিত্য হোক আর যা-ই হোক, নিজের বলার কথাটিকে প্রতিফলিত করছে না দেখতে পাওয়া যায়, তখনই আসে নিজে ভেবে গুছিয়ে নতুন সৃষ্টির তাগিদ। ব্যাপারটি এমন স্বতঃসিদ্ধ যে এ সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন দেখি না।

সাহিত্য-নিরপেক্ষ বলতে আপনারা কী বোঝাতে চেয়েছেন? অন্যের গল্প না-নেওয়া? অথবা অন্য কিছু? কথাটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যদি আর কোন লেখা না-নিয়ে এবং সেই সঙ্গে অন্য কোন উৎস থেকে প্রেরণা না-পেয়ে, নিজের তাগিদে নিজের কথা বলার ব্যাপারটিকেই ভেবে থাকেন—

তা হলে বলব সেক্ষেত্রে সমস্যা প্রারম্ভিক শিল্পীর সমস্যা, একেবারে নিজের উপলব্ধি ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করার সমস্যা। তার সুবিধে এবং অসুবিধে মূলত অন্য যে-কোন প্রারম্ভিক শিল্পসৃষ্টির সুবিধে এবং অসুবিধের মতোই, কোন তফাত নেই। ফিল্মের নিজস্ব সমস্যা এটা না, যে-কোন শিল্পীর মূল সমস্যারই ক্ষেত্রবিশেষের রূপান্তর।

তবে হ্যাঁ, স্বাধীনতা সম্পূর্ণ। আমাকে আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। আমিই এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা। যা বুঝেছি তা-ই তুলে ফেলব।

অসুবিধে? তা হবে বৈকী। খুব সম্ভাবনা আছে ধ্যাড়ানোর। নিজের চিন্তা যদি স্ফটিকস্বচ্ছ আকার ধারণ না-করে, জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। অপরের দেওয়া শিরদাঁড়াটা নেই তো এখানে।

অবশ্য নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক ভাবলে এ নিয়ে দিশেহারা হবার কোন কারণ নেই। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজে হেঁটে নিজের পথে চলতে গেলে যদি পটল তুলি, সেটাও মোটামুটি প্রাপ্তবয়স্কের মতো ব্যবহারই হবে এবং সেটা অপরের শাড়ির আঁচল ধরে চলার থেকে বোধ হয় সার্থকতরও হবে।

কোন পরিচালকই তাঁর প্রথম তৈরি script অনুসরণ করে চলতে পারেন না। আমিও না। বাংলায় যাকে বলে 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা,' সেটা সর্বদাই করতে হয়। যেমন সংলাপ তেমনই চিত্রনাট্যের অন্যান্য দিক সম্পর্কেও এ কথাটা খাটে।

(ছবির ক্ষেত্রে সাহিত্যমূল্য ও তার চলচ্চিত্রায়ণের) মধ্যে কোন পার্থক্য আমি বুঝতে পারি না। ঘটনাটা হচ্ছে, মানবজীবনের বিভিন্ন প্রকাশ। এর মধ্যে কোন্ medium-কে আমি ব্যবহার করলাম, সেটা একদম কোন বড় কথাই নয়। মানুষকে ভালোবাসাটাই বড় কথা। শুধু জীবনযাপনের, প্রাণধারণের গ্লানি— এটাই কি জীবন? ভালোবাসতে গেলে সেটা প্রাণ দিয়ে করতে হয়। এবং আমি জানি না আমি পেরেছি কি না।

আমার. . . মনে হয় সিনেমা এখনও সাহিত্য এবং ভাস্কর্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। অবশ্য এ কথা ভুললে চলবে না যে সাহিত্য এবং ভাস্কর্যের ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন, সিনেমা সবে মাত্র তার কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পদার্পণ করেছে। এখনও অনেক এগোনোর রয়েছে। তবে আমার বিশ্বাস সিনেমাও একদিন অন্য যে-কোন শিল্পের পাশে নিজের স্থান করে নিতে পারবেই।

সিনেমা একটা দৃশ্যমাধ্যম, এ কথাটা অসম্পূর্ণ। চলচ্চিত্র আদতে একটা দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম, কেবলই দৃশ্যমাধ্যম নয়। আর সিনেমায় এ দুটোরই সমান গুরুত্ব। এ ছাড়াও সিনেমায় আরও কিছু ব্যাপার আছে আপনার প্রশ্নে উল্লিখিত হয়নি। চলচ্চিত্রকারদের এটাই তপস্যা হওয়া উচিত যে কী ভাবে তাঁরা সব ক'টি শাখার সমন্বয় ঘটাবেন, যাতে ছবির সংযুক্ত প্রভাব দর্শকদের ওপর পড়ে। সেটাকেই আমি আদর্শ বলব যেখানে একটি উপকরণ আর-একটির ওপর আরোপিত হয় না। যাঁরা ছবি দেখছেন তাঁদের এটা জানা উচিত যে সিনেমায় কখনও অভিনয় গুরুত্ব পায়, কখনও দৃশ্যকল্প, কখনও নাটকীয় উপাদান, আবার কখনও সঙ্গীত বিশেষ মূল্য পায়। সঙ্গীতের মাহাত্ম্য অধিকাংশ দর্শকই বোঝেন না, এটা খুবই দুঃখজনক। নৈঃশব্দ্যেরও কিছু-কিছু ব্যাপার ছবিতে আছে যা সিনেমাকে আরও অর্থবহ করে তোলে, যার যোগ soundtrack-এর সঙ্গে। তা ছাড়া ছবিতে 'নিশ্চলতা'ও একটা বিশিষ্ট আঙ্গিক হিশেবে স্বীকৃত। ছবিতে হঠাৎ ঘটনাক্রম, প্রসঙ্গ বা action হঠাৎ স্থির হয়ে গেলে অর্থাৎ freeze হলে তারও একটা প্রচণ্ড প্রভাব তৈরি হয়। এ প্রসঙ্গে বিশ্বের মহান চলচ্চিত্রকারদের শিল্পকৃতির অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়।

ফিল্মকে 'চলচ্চিত্র' বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। চলচ্চিত্রকে রেখাঙ্কিত করার জন্য গতিহীন বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কোথাও ক্ষণিক বিরাম, কোথাও নিশ্চলতা সিনেমায় প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করে। কখনও-কখনও সম্পূর্ণ অনাটকীয়তা পরবর্তী নাটকীয় মুহূর্তের দ্যোতনা এনে দেয়।

(সিনেমা অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের) পরিমার্জিত (রূপ) বলাটা ভুল হবে। কেননা কোন শিল্পই অন্য শিল্পের সংস্কারের দ্বারা সৃষ্ট, এ দাবি করা যায় না। পৃথিবীতে প্রত্যেকটি শিল্পেরই স্বতন্ত্র স্থান আছে। তাদের স্ব-স্ব প্রকাশভঙ্গি, কৌশল এবং শিল্পসীমাও ভিন্নতর। সিনেমা যা বলতে পারে, তা অন্য শিল্প-রীতির পরিধির বাইরে। অনুরূপ ভাবে অন্য শিল্পমাধ্যমে যা করা সম্ভব, চলচ্চিত্রে তা করা যায় না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তুলনা বা প্রতিযোগিতার প্রশ্ন ওঠে না। চলচ্চিত্র একটা পৃথক্ শিল্পভাষা, এটাই আসল কথা।

ছবিটাকে আমি একটা শিল্প বলে ধরি, কাজেই মনে করি সর্ব শিল্পের শর্ত পালিত হচ্ছে এখানেও।. . . ১৯২৫ সালে তোলা আইজেনস্টাইন-এর 'Strike' ছবির চেয়ে বেশি সমাজসচেতন ছবি কি আজ পর্যন্ত তোলা হয়েছে? পাবসট-এর 'Kameradschaft' আজও পর্যন্ত আমার কাছে মনে হয়

সবচেয়ে বেশি সমাজ-সচেতন একটি ছবি। চারু রায়ের 'বাংলার মেয়ে' বহু আগে তোলা— প্রথম বাংলা ছবি, যাতে outdoor ব্যবহৃত হয় সবচেয়ে বেশি ভাবে, তাতেও সমাজচেতনা পরিপূর্ণ ছিল। নিমাই ঘোষের 'ছিন্নমূল' আজকের যুগের যুগপ্রবর্তক। তার চেয়ে বেশি কি আমরা এগুতে পেরেছি চেতনায়? শিল্পরসোত্তীর্ণতার কথা আমি এখানে তুলছি না, শুধু চেতনার কথা বলছি। রবি ঠাকুর মশায় একটা বড় ভালো কথা বলে গিছলেন, 'শিল্পকে শিল্প হতে হলে সর্বাগ্রে সত্যনিষ্ঠ হতে হয়, তারপরে সৌন্দর্যনিষ্ঠ'। কথাটা ভাবার মতো। যদি পারেন ভেবে দেখবেন।

আমার হাতে এখন তিনটি ছবি। একটি ঢাকায়— 'তিতাস একটি নদীর নাম'। আর-একটি কলকাতায়— 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'। আরও একটি দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে— এটি character study, documentary বলা ভুল।

তিতাসের গল্পটা— অদ্বৈত মল্লবর্মণ যা বলার চেষ্টা করেছেন তা হচ্ছে : নদীর ধারে একটা জেলেদের সমাজ এবং সেই নদীটা আস্তে-আস্তে শুকোতে-শুকোতে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সেই সঙ্গে সেই সমাজটাও চুরমার হয়ে গেল। তার স্মৃতি বহন করছে শুধু একটি ব্যাপার— আশে-পাশের গ্রামের লোক এখনও বলে যে এখানে তিতাস নামে একটা নদী ছিল।

অদ্বৈতবাবু এখানে শেষ করা সত্ত্বেও আমি একটু টেনে ছেড়েছি। নদী আর নেই, কিন্তু ধানের ক্ষেত রয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে একটা সভ্যতা শেষ হয়ে-যাওয়াটাই শেষ নয়। তার মৃত্যুর মধ্যেই উপ্ত আছে নতুন সভ্যতার বীজ। এ ভাবেই মানব-জীবনপ্রবাহ চলে। বাবা ও ছেলের সম্পর্কের মতো।

'যুক্তি তক্কো' সম্পূর্ণটাই ১৯৭০ থেকে ১৯৭২ সালের গোড়া পর্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে দিন-রাত্রি বাস করে যে-জীবনপ্রবাহ আমি দেখেছি, তার ওপর ভিত্তি করে করা। একটা সুতীব্র আক্রমণ এ ছবির লক্ষ্য। এমন সব ঘটনা ঘটছে, যা ঘটা উচিত নয়। এ অন্যায়, এ পাপ।

অবশ্য ব্যাপারটা নতুন নয়। সৎ শিল্পীরা সব সময়েই এ প্রতিবাদ করে আসছেন। প্রতিবাদ করা শিল্পীর প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। শিল্প ফাজলামি নয়। যারা প্রতিবাদ করছে না, তারা অন্যায় করছে। শিল্প দায়িত্ব। আমার অধিকার নেই সে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার। শিল্পী সমাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। সে সমাজের দাস, এই দাসত্ব স্বীকার করে তবে সে ছবি করবে।

যখন আমার 'তিতাস' করার কথা আসে তখন এ দেশটা সবে স্বাধীন

হয়েছে। এবং most unsettled. এখনও যে খুব একটা স্বাধীন হয়েছে তা মনে হয় না। কিন্তু তবু তখন একেবারে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না কী চেহারা নেবে। সব শিল্পই দু'রকম ভাবে করা যায়। একটা হচ্ছে খবরের কাগুজে শিল্প। সেটা করতে পারতাম। আর-একটা হচ্ছে উপন্যাস— যেটা lasting value. সেটার জন্য থিতোতে দিতে হয়। নিজের মাথার মধ্যে অভিজ্ঞতা খরচা করতে হয়। Time দিতে হয়— ভাবতে হয়। It takes two-three years, four years and then only you can make such a film, otherwise you cannot be honest. তুমি খবরের কাগুজেপনা করতে চাও করতে পারো। আমি খবরের কাগুজে তো নই। আমি অনেক গভীরে ঢোকার চেষ্টা করি। কাজেই তখন ফট করে এসে— পঁচিশ বছর যেখানে আসিনি, সেখানে এসে কিছু বুঝতে না-বুঝতে, নাড়ির যোগ করতে না-করতে, দেশের মানুষকে গঞ্জে, বন্দরে, মাঠে, শহরে যাদের দেখি না, জানি না, চিনি না— আমি পাকামো করতে যাব কোন্ দুঃখে? আমার কোন অধিকারই নেই। এই হচ্ছে এক। আর দু'নম্বর হচ্ছে, তখন condition কেমন fast changing, এটা, ওটা, সেটা, নানা রকম, তার মধ্যে থেকে একটা pattern আস্তে-আস্তে বেরোক। আমি ভাববার সুযোগ-সুবিধা পাই। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ হোক বারে-বারে। আস্তে-আস্তে ঠিক সময়েই ওটা হবে। আর ফরমায়েশ দিয়ে শিল্প হয় না। তুমি হুকুম দিলে 'দরবেশ' খাব, কী 'রাঘবশাহি' খাব কী 'রসকদম্ব' খাব, তা নয়। 'দৈ দাও মরণ চাঁদের' এ ব্যাপারটা নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমার ভেতর থেকে যখন ইচ্ছে আসবে, তখন করব। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে সেইটে করার পক্ষে, 'তিতাস'টা ছিল আমার পক্ষে ideal, কারণ 'তিতাস' ছিল একটা subject, যে-subject মোটামুটি যে-বাংলাটা নেই আর, আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেকার বাংলা। তার ওপর তো পটভূমিটা। এর subject-টা হচ্ছে এমন যা বাংলাদেশের সর্বত্র ঘোরার সুযোগ দেয়— গ্রাম-বাংলাকে বোঝার সুযোগ দেয়। গাঁয়ে গিয়ে shooting করাটা বড় কথা নয়। Shooting করার ফাঁকে-ফাঁকে মানুষের সাথে মেশা, নাড়ির স্পন্দনটাকে বোঝার চেষ্টা করা। কাজেই 'তিতাস'টা একটা অজুহাত এ দিক থেকে। এবং ঐ অবস্থায় 'তিতাস' ধরে করলে হয় কী, সেই মা-কে ধরে পুজো করা হয়। তা এতগুলি কারণেই এই 'তিতাস' পরে হতে পারত না। এখনও 'তিতাস' আমার একটা study আর আমার একটা worship হিসাবে দেখা যেতে পারে। This river, this land, this people এদের মধ্যে যাবার একটা ব্যাপার আছে, আবার আছে এর সঙ্গে নিজেকে reestablish করা। আর শেষ কথা হচ্ছে, ও-সময় ওটা time ছিল না এবং time এখনও

আসেনি। এখনও serious study করে serious work, যেটা আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে লোকে দেখে কিছু বুঝবে, সে রকম ছবি করার অবস্থা এখনও আমার আসেনি। মানে আমি এখনও এতটা বুঝে উঠতে পারিনি— কোন্ দিকে যাবে ইতিহাস। আমি যে-দিন তাগিদ বোধ করব, আমি ঠিক জুড়ে দেব। বুঝতে পেরেছ?

'তিতাসে'র shooting অনেক আগে আরম্ভ হয়, কিন্তু কথাবার্তা পাকা হয় আগে 'যুক্তি তক্কো'র। কিন্তু সরকারি ব্যাপার, ছবিটা FFC-র টাকা নিয়ে করা, ঐ টাকা-ফাকা পেতে দু'চার মাস লেগে যায়, ওরই ফাঁকে 'তিতাসে'র লোকেরা এসে যায়, আমি ঢাকায় গিয়ে ছবির কাজ আরম্ভ করি।

বাংলাদেশ বলতে আমার যা ধারণা ছিল, ঐ দুই বাংলা মিলিয়ে, সেটা যে তিরিশ বছরের পুরনো, সেটা আমি জানতাম না। আমার কৈশোর এবং প্রথম যৌবন পূর্ব বাংলায় কেটেছে। সেই জীবন, সেই স্মৃতি, সেই nostalgia আমাকে উন্মাদের মতো টেনে নিয়ে যায় তিতাসে, তিতাস নিয়ে ছবি করতে। 'তিতাস' উপন্যাসের সেই period-টা হচ্ছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগেকার, যা আমার চেনা, ভীষণ ভাবে চেনা। 'তিতাস' উপন্যাসের অন্য সব মহত্ত্ব ছেড়ে দিয়েও এই ব্যাপারটা আমাকে প্রচণ্ড ভাবে টেনেছে। ফলে 'তিতাস' একটা শ্রদ্ধাঞ্জলি গোছের, সেই ফেলে আসা জীবনস্মৃতির উদ্দেশে। এ ছবিতে কোন রাজনীতির কচকচি নেই, উপন্যাসটা আমার নিজের ধারণায় epic-ধর্মী, এ ছবিতে আমি প্রথম এই ঢংটা ধরার চেষ্টা করেছি। আমার শৈশবের সঙ্গে তিতাসের বহু ঘটনা জড়িয়ে আছে, অনেক কিছু আমি নিজের চোখে দেখেছি, ঐ যে বললাম এই তিরিশ বছর মাঝখানে blank, আমি যেন সেই তিরিশ বছর আগেকার পূর্ব বাংলায় ফিরে যাচ্ছি।

একুশে ফেব্রুয়ারি ওরা আমাকে, সত্যজিৎবাবুকে এবং আরও কয়েক জনকে State guest করে নিয়ে গিয়েছিল ঢাকায়। Plane-এ করে যাচ্ছিলাম, পাশে সত্যজিৎবাবু বসে, যখন পদ্মা cross করছি তখন আমি হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেললাম। সে বাংলাদেশ আপনারা দেখেননি, সেই প্রাচুর্যময় জীবন, সেই সুন্দর জীবন. . . আমি যেন সেই জীবনের পথে চলে গেছি, সেই জীবনের মাঝখানে. . . এখনও যেন সব সে রকম আছে, ঘড়ির কাঁটা যেন এর মাঝে আর চলেনি। এই বোকামি নিয়ে, এই শিশুসুলভ মন নিয়ে 'তিতাস' আরম্ভ।

ছবি করতে-করতে বুঝলাম সেই অতীতের ছিটেফোঁটা আজ আর নেই, থাকতে পারে না। ইতিহাস ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, ও হয় না, কিস্‌সু নেই,

সব হারিয়ে গেছে। এ ছবির script লেখা থেকে shooting-এর অর্ধেক পর্যন্ত আমি মানুষের সংস্পর্শে প্রায় আসিনি। ঢাকায় আমি থাকতাম না, এখান থেকে ঢাকায় touch করে চলে যেতাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নইলে কুমিল্লা, নইলে আরিচাঘাট, পাবনা, নারায়ণগঞ্জ, বৈদ্যর বাজার এই সব, মানে গ্রামে-গঞ্জে, ছবিটা তো গ্রাম-গঞ্জ-নদী নিয়েই, কাজেই সমস্ত সময়েই গ্রামে থেকেছি। ঢাকায় একদিন rest নিয়েই চলে গেছি, কারওর সঙ্গে দেখা করিনি, মিশিনি। ওদের রাজনীতি কী হচ্ছে না-হচ্ছে তাকিয়ে দেখিনি, খবরের কাগজ পর্যন্ত সব সময় দেখে উঠিনি।

কাজেই ছবি করার first half পর্যন্ত এখনকার বাংলাদেশের যা চেহারা তার থেকে completely বিচ্ছিন্ন ছিলাম, আমি নিজেকে সমস্ত কিছু থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম। তারপর ঢাকায় গিয়ে কয়েক দিন থাকতে হল, ছবির এটা-ওটা-সেটার জন্য। তখন ক্রমশ দেখলাম সমস্ত জিনিশটা ফুরিয়ে গেছে, মানে একেবারেই গেছে, আর কোন দিন ফিরবে না। এটা খুবই দুঃখজনক আমার কাছে, কিন্তু দুঃখ পেলে কী হবে, ছেলে মারা গেলে লোকে শোক করে, কিন্তু it is inevitable.

মানুষের চিন্তাধারা পালটে গেছে, মানুষের মন গেছে পালটে, মানুষের আত্মা গেছে পালটে। টাকাকড়ির সমস্যা, খাওয়া-দাওয়ার সমস্যা, দারিদ্র্য ওখানেও আছে। চুরি-জোচ্চুরি, বদমাইশি ওখানেও আছে, এখানেও আছে। এখানে চুরি-জোচ্চুরি, বদমাইশি পাইপগান-বোমা-পেটো এ সব নিয়ে হয়। ওখানে একটা সুবিধে হয়েছে এ ব্যাপারে, খানসেনারা প্রচুর arms ফেলে গেছে, সে সব দিয়ে ঐ সব হচ্ছে। কিন্তু সমস্যাটা একই, মানুষের সাংস্কৃতিক মন পচে গেছে, অতীতের সঙ্গে নাড়ির যোগ একেবারে কেটে গেছে।

অবশ্য আশার কথা, কিছু young ছেলে সবে university-তে ঢুকছে, বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছে, এমন সব ছেলে, তাদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বোধ এবং অত্যন্ত সচেতনতা এসেছে। এরাই ভরসা, ওখানকার ভালো যা কিছু সবই এদের contribution.

ছবিতে interference সে রকম কিছু হয়নি। আর্থিক দিক থেকে যখন যা চেয়েছি তা এরা দিয়েছে। আশ্চর্য ঘটনা, শিক্ষাই হল বলা যায়, কলকাতার এই হ্যাংলা জায়গায় থেকে আমার একটা ধারণা ছিল যে, ছবির ব্যাপারে পয়সাটাই একমাত্র সমস্যা, পয়সার যদি সমাধান করা যায় অর্থাৎ পয়সা-ওয়ালা লোক যদি জোটে, তা হলে ছবির ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত, পয়সা থাকলেই ছবি হয়। এই প্রথম আমার অভিজ্ঞতা হল, শুধু পয়সা থাকলেই ছবি হয়

না। ওখানে যন্ত্রপাতি, film-এর অভাব, artist-এর অভাব, সে যে কী অসুবিধে, কী কষ্ট, technician ছাড়া কেউ বুঝবে না, যারা worker তারাই বুঝবে। অসুবিধে এখানেও আছে, বম্বেতেও আছে। আমি কলকাতা, বম্বে, পুনা, সব জায়গাতেই ছবি করেছি, অসুবিধেগুলো আমি জানি। কিন্তু সমস্ত অসুবিধে hundred times magnified সেখানে। যন্তর চাই, যন্তর নেই, editing room চাই, নেই, পাওয়া যাবে না। Sound machine এখানে হাত দিলে ওখানে ঝম করে ঝরে পড়ে, সব একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে, misuse করে-করে। Brilliant সমস্ত মেশিন, এমন সব মেশিন বাপের জন্মে কখনও দেখিনি। ক্যামেরার যা সব lense আছে ওখানে, বাপের জন্মে এখানে সে সব দেখিনি, কিন্তু বাজে ভাবে use করে, misuse করে এমন কাণ্ড করেছে যে সেগুলো properly use করা যায় না। ফলে প্রতি দিন প্রচণ্ড বিপদ এবং অসুবিধের মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাদের।

(কলাকুশলী, শিল্পীরা) আপ্রাণ করেছে, ওদের পক্ষে ওর মধ্যে যা possible তা ওরা করেছে। ছবির producer সে-ও young, অত্যন্ত বড়লোকের ছেলে, এ সবের মধ্যে কখনও ঢোকেনি। ফিল্ম সম্পর্কে ওর ধারণা ঋত্বিকদা একটা ছবি করবে, cut to air-conditioned hall-এ বসে ছবি দেখছি। ছবি করা মানে যে এক বছরের প্রচণ্ড পরিশ্রম, সেটা ওর ধারণা ছিল না। টাকা দিলাম, ঋত্বিকদা ছবি করবে, ছবি release হবে, hall-এ বসে ছবি দেখব, টাকা পেলাম না-পেলাম বয়ে গেল, ছবি না-চললে কিছু এসে যায় না, ছবি ভালো করতে হবে। এ রকম ছেলে আমি আগে পাইনি। অন্যান্য কলাকুশলী বা শিল্পীরা, সবাই চেষ্টা করেছে, খেটেছে— আবার সব জায়গাতেই কিছু ত্যাঁদড় থাকে, ওখানেও ছিল।

আমাকে এটা ওরা বলেছিল যে, ইন্ডিয়া থেকে শুধু আপনি আসবেন, আমি বললাম যে, একজন assistant director, ওরা বলল যে, না, তা-ও চলবে না। আমি বললাম, OK, তা-ই করেগা, ওহি করেগা। ফলে আমার অসুবিধে হয়েছে। ওখানকার ছেলেদের আস্তে-আস্তে তৈরি করে নিয়ে সে অসুবিধে আমি কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি, কিছু ছেলে ভালো, প্রাণপণ খেটে cooperate করেছে, কিছু ছেলে করেনি। খবরের কাগজওয়ালারা গোড়ার দিকে আমায় সুচক্ষে দেখেনি, প্রথম-প্রথম দল বেঁধে আমার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছে। দশ-বারো জন মেয়ের constant role, ঐ মেয়েদের সামনে drink করা নিয়ে ভয়ঙ্কর কথা উঠত। কিন্তু আমার হাবভাব, চলা-বসা, ছবি করা, পদ্ধতি, ঢং, সমস্ত কিছু তারা দেখেছে, বুঝেছে drink করাটাই সব নয়, drink করলেও shooting-এ কোন গণ্ডগোল হয় না, তখন

আমার সম্পর্কে তাদের ধারণা পালটেছে, এবং ঐ opposition-এর বদলে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, কাগজওয়ালাদের সঙ্গেও। আমি এখন film line-এর লোকজনদের কাছেও মোটামুটি accepted.

ছবি finally আমি কাটতে পারিনি, ছবি কী হয়েছে আমি জানি না, ছবি আমি দেখিনি। অনেকে বলছে editing খারাপ হয়েছে। খবরের কাগজের review দু-চারটে পড়েছি, favourable, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা।

আমি বলে দিয়ে এসেছি, কিন্তু তা কী হয়! একটা কথা বলি শুনুন, film director আমরা নই। film director হল, যে আর-এক জনের গল্প কেনে, এক জনকে দিয়ে scenario লেখায়, নিজে direction দেয়। আর direction মানে floor-এ দাঁড়িয়ে থাকে, start/cut করে। Cameraman camera সাজায়, সব কিছু করে, assistant-রা কাজ করে, editor edit করে, music director music take করে। আমরা creator, চিত্রস্রষ্টা। ছবি প্রথম ইঞ্চি থেকে শেষ frame অবধি আমার সন্তান, নিজের বাচ্চাকে যে-রকম ভালোবাসি, ছবিকে সেই রকমই ভালোবাসি। আমি কাটলাম না, কেটে দেখলাম না কী হয়েছে, কাজেই মনের মধ্যে সংশয় থাকবেই। 'তিতাস' আমি সম্পূর্ণ দেখিনি— কাগজে পড়েছি বা লোকজনদের মুখে শুনেছি, editing নাকি খারাপ হয়েছে। যারা বলছে তাদেরও আমি খুব একটা. . . হয়তো দেখব একটা minor গণ্ডগোল যেটাকে অত্যন্ত বিরাট করে দেখা হচ্ছে। আর public response, প্রথম দিকে দারুণ roaring, (তারপরে) ঋত্বিক ঘটকের ছবি যা হয়, যথা-রীতি ঐ, দশ আনা-ছ'আনা খালি, একেবারে flop, শিক্ষিত লোকজন ছবি দেখছে, কিন্তু পয়সা উঠছে না। ঐ একেবারে বাঁধা ব্যাপার।. . .

(কাহিনীর হুবহু অনুসরণ) সম্ভব নয়। অদ্বৈতবাবুর কাহিনী অবলম্বনে বলা যায়। ছবিটা আমার মনে হয়েছে খুব delightful. এখানে আসার কথা আছে, যদি আসে, তা হলে আমি আবার কেটে, edit করে re-recording করে ছাড়ব। তখন দেখবেন, আমার ধারণা শিশুর মতো সরল মন নিয়ে ছবিটা করা হয়েছে। অদ্বৈতবাবুর পক্ষে যা স্বাভাবিক ছিল, তা-ই তিনি করেছেন, শেষ করেছেন একটা অবক্ষয়ের মধ্যে, সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমার রাজনৈতিক বক্তব্য, সেখানে আমি সম্পূর্ণ প্রাণের পক্ষে, নতুন জীবনের ইঙ্গিতে ছবি শেষ করেছি। একে Marxism বলা যায়, Humanism বলা যায়, রাজনীতি বলা যায়, আবার না-ও বলা যায়।

(অসুস্থ হয়ে) বিছানায় শুয়ে বুঝিয়ে দিয়েছি, এর পরে এই করো, এর পরে এই করো। Rush-ও আমি দেখিনি ছবির শেষের দিকের। কিন্তু

কলকাতার ছবিটা সম্পর্কে এই জন্য আমি একমত যে এর দশ আনা অংশের বেশি হয়ে গেছে। যতখানি হয়েছে, ততখানি আমার নিজের পরিষ্কার তত্ত্বাবধানে, নিজে হাতে আমি কেটেছি, নিজে হাতে আমি কাটছি, কাটব। কাজেই এখানে সমস্ত জিনিশটা আমার নিজের কব্জার মধ্যে। ওখানে জিনিশটা আমার কব্জার মধ্যেই নয়। এখানে যা অসুবিধে, তা হচ্ছে যে ওখানকার ছবিটার জন্যে দোর, তার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যে দেরি, plus টাকাকড়ির গণ্ডগোল আছে কিছু। দেখুন মশায়, একশোটা মেয়ের বিয়ে দিতে যা খাটতে হয়, একটা ছবি করতে সেই খাটনি পড়ে। বাধা আসবেই। বিপত্তি আসবেই, গণ্ডগোল হবেই। আপনারা সব ইতিহাস জানেন যে, মারধর না-খেলে ছবি শেষ হয় না।

Obstruction তো সব ছবিতেই আছে। Without obstruction কোন ছবি কোন দিন হয়নি। 'তিতাস'-এ আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, আর এটাও editing-এর মাঝখানে অসুস্থ হওয়াতে গেল পিছিয়ে। So both of them are suffering.

কলকাতার ছবি সম্পর্কে, মানে যেটুকু হয়েছে, পরিপূর্ণ ভাবে satisfactory. কিন্তু সে কথা আমি বলতে পারছি না ঢাকার ছবি সম্পর্কে। ঢাকার ছবি শেষে কী দাঁড়িয়েছে, সে দেখার মতো অবস্থা আমার ছিল না। আমি তখন হাসপাতালে। কাজেই তারা কী করেছে শেষ অবধি, সে সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। I am not sure. আমার নিজের ধারণা তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু generally speaking, এতই নিম্নস্তরের ঢাকার ছবি যে তার দ্বারা influenced হয়ে আমি যে মহৎ ছবি করার চেষ্টা করেছিলাম, সেটা একটা cheap ছবিতে পরিণত হওয়া খুব সোজা। কাজেই ছবি আমি না-দেখে কিছু বলতে পারব না।

Last shot নেওয়া হল বালির মধ্যে বেলা দুটোর সময়, তপ্ত বালির মধ্যে আমার heroine মারা গেল। সেই shot-টা নিলাম। ছবির last shot, সঙ্গে-সঙ্গে বালির মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

Shooting complete. . .

বাংলাদেশ কথাটাই আমার কাছে খুব খটকাজনক। এখনও ঠিক বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংজ্ঞা আমার অস্থিমজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হয়নি। এখনও পর্যন্ত ও-কথাটাকে আমি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানেতেই বুঝে থাকি। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, কুশিয়ারা, তিস্তা,

সুরমা ও তিতাস-অধ্যুষিত বাংলার এই ভূভাগ আমাকে আকর্ষণ করে, তাই এই ছবি করার প্রস্তাব একজন হটেনটট অথবা জুলু-র কাছ থেকে এলেও সমান ভাবে গ্রহণ করতাম।

কলকাতা থেকে এখানকার যন্ত্রপাতি উন্নত তো নিশ্চয়ই। এ ছাড়া এখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরও যথেষ্ট মূল্য আছে। তবে সুবিধে-অসুবিধে ব্যাপারটা সব ছবিতেই থাকে। কোথাও বেশি, কোথাও বা একটু কম। যে-ধরনের অসুবিধে হওয়ার কথা তার থেকে কিছু কমই হয়েছে বলে আমার ধারণা। তবে যেটুকু হয়েছে সেটা যে-কোন ছবির পক্ষেই যথেষ্ট ক্ষতিকর, কারণ এমন একটা দেশে এমন একটা সময়ে ও এমন একটা বিষয় নিয়ে আরম্ভ করা গিয়েছিল, যেটা এখন অভিজ্ঞতার পুঁজি হবার পর ভাবলে মনে হয়, হাড়িকাঠে বলির পাঁঠার মতো মাথা গলিয়ে দিয়েছিলাম। এ ছবি এ দেশে এ অবস্থায় এখন আরম্ভ করে হয় এক উন্মাদ, নয় একটি গর্দভ— যার দুটোই আমি।

'তিতাস' পূর্ব বাংলার একটা খণ্ডজীবন, এটি একটি সৎ লেখা। ইদানীং সচরাচর বাংলাদেশে (দুই বাংলাতেই) এই রকম লেখার দেখা পাওয়া যায়নি। এর মধ্যে আছে প্রচুর নাটকীয় উপাদান, আছে দর্শনধারী ঘটনাবলি, আছে শ্রোতব্য বহু প্রাচীন সঙ্গীতের টুকরো। সব মিলিয়ে একটা অনাবিল আনন্দের সৃষ্টি করা যায়, আমার মনে হয়েছিল, তাই এটা করছি। ব্যাপারটা ছবিতে ধরা পড়ার জন্য জন্ম থেকেই কাঁদছিল, সুযোগ পেয়েছি, ধরেছি।

(বাংলাদেশে ছবি করতে গিয়ে 'তিতাস' করাটা) মোটেই coincidence নয়। আমাদের যে পূর্ব বাংলার. . . আমাদের দেশটা তো riverine country, নদীমাতৃক দেশ। তার ওপরে দুটো মাত্র উপন্যাস আছে। মানিকবাবুর 'পদ্মানদীর মাঝি' আর এই অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস'। ব্যাপারটা হচ্ছে, মানিকবাবুর লেখা অনেক তীক্ষ্ণ। অসম্ভব। তো, আপনারা জানেনই যে মানিকবাবুর কথা তো বলে কোন লাভ নেই. . . মানে ওঁর লেখনী একটা তীক্ষ্ণতম ব্যাপার। কাজেই অত্যন্ত বেশি tight. অত্যন্ত কমের মধ্যে অনেক বেশি বলা উনি বলেছেন। কিন্তু উনি দেখেছেন এই জেলেদেরকে বাবুদের চোখ থেকে। তিনি ভদ্রলোকের ছেলে, তিনি কিছুতেই. . . ঐ যে. . . একটা জায়গায় গণ্ডগোলটা আছে আর কী। আর এই অদ্বৈত মল্লবর্মণ নিজে এক জন মালো, নিজে এক জন জেলে। সে একটা মানে, blah-blah করে গেছে। মানে গুচ্ছের অকারণ কথা আছে। কিন্তু from inside— একেবারে ওদের গভীর থেকে দেখা। সে নিজে যে মালোর ছেলে। এবং ঐ গোকর্ণ

গ্রামে তার বাড়ি। যেখানে এ বারে আমি ছবি করলাম আর কী। সেই গ্রামের একমাত্র graduate. মানে ঐ মালোদের মধ্যে। তা কাজেই তার লেখা. . . সুখদুঃখ. . . এগুলো অন্য level-এ চলে গেছে। ওটাকে edit করার প্রশ্ন ছিল। সেটা বোধ হয় আমি করতে পেরেছি। আমি জানি না করতে পেরেছি কি না। 'তিতাস' প্রথমেই পড়ে আমি. . . যখন প্রথম এটা বেরল. . . অদ্বৈত তো তখন TB হয়ে মারা গেল। আমার বন্ধু ছিল। তখন থেকে আমার মাথায় যে, এটা আমি ছবি করব। এটা আমার দারুণ ভালো লেগেছিল। কিন্তু ঘটনাটা হচ্ছে যে ওদেশে আমাকে যেতে দেবে না, তখন আয়ুব খাঁ-র দেশ। আমি কমিউনিস্ট, আমাকে visa দেবে না কিছুতেই। কাজেই I could not do. এবং আমাকে বহু বার বহু লোক বলেছে যে, এখানে করো। আমি বলেছি, এখানে হয় না। ঐ নদী, ঐ জমি, ঐ নৌকা, ঐ মুখ এ দেশে পাওয়া যাবে না। তখন থেকে মাথায় ঘুরছে। কাজেই প্রথম (থেকেই). . . আমার বোন কুমিল্লায় থাকে এখন। আমারই যমজ বোন। তার বাড়িতে আমি গেছলাম। আমি State guest হয়ে গেছলাম ঐ সময়, বাহাত্তরের গোড়ায়, একুশে ফেব্রুয়ারি। ঐ বাংলাভাষা দিবস। আমি আর সত্যজিৎ গিয়েছিলাম। তখনই আমার বোনের কাছে গেছলাম কুমিল্লায়— ঐ function-টাংশন শেষ করে। ফেরার পথে আমার বোনের এক বন্ধু, একটি মুসলমান ছেলে, সে আমায় বললে যে, আপনি 'তিতাস' কেন করছেন না? আমি বললুম, yes, এইটেই করব। কাজেই আমার এটা ফট করে ইচ্ছে নয়। বহু দিন থেকে মাথার মধ্যে ছিল— সুযোগ পেলাম, করলাম।

('তিতাস'-এ মালোদের সঙ্গে ভাগচাষিদের link) হারায়নি। আর-একবার দেখলে বোধ হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। ঢাকায় আমাকে এই প্রশ্নই করেছিল, আমি তাদের বুঝিয়ে বলেছিলাম। জিনিশটা কী? জিনিশটা হল একটা নদী, তিতাস। নদীমাতৃক সভ্যতা আমাদের পুব বাংলা। তোমরা পুব বাংলার কতটা দেখেছ আমি জানি না, কতটা গভীরে ঢুকেছ, তা-ও জানি না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ ভাবে গভীরে ঢুকেছি। তিতাস একটা নদী, যে-নদী হচ্ছে sustaining force. সেই নদীটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তারপর একদিন সেই নদীটা শুকিয়ে গেল। তখন নদীর মধ্যে যে-জমিটা জেগে উঠল তা আর জেলেদের থাকল না, তখন চাষিরা forefront-এ এসে গেল।

Economic base-টা তো বার-বার ছবিতে বলা হয়েছে, বলা হয়েছে ঐ যে টাকা ধার দেওয়া, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ, তার পর একদিন বাড়িঘরদোর জ্বালিয়ে দেওয়া— Economic base-টাই তো মূল ব্যাপার। ঐ so called

স্বাধীনতার আগের পুব বাংলাকে তোমরা যদি জানতে তো বোধ হয় এ প্রশ্ন করতে না। বাবুরা যে কী পরিমাণ অত্যাচার করেছে ওদের ওপর, ঐ তোমরা যাকে scheduled caste বলো, তাদের ওপর, সে ভাবা যায় না। এবং সে কারণেই they all voted for মুসলিম লিগ। এবং during partition এবং before partition they all sided with মুসলিম লিগ। এবং after partition তারাই রয়ে গেছে। যতগুলো জমিদার, সবগুলো চোর, almost all, very few হয়তো ভালো। ঐ ভাবে কত বার যে তারা কত লোককে, কত সম্প্রদায়কে উৎখাত করেছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। আমি নিজে জমিদার-বাড়ির ছেলে— আমার নিজের পরিবারে নিজের বাড়িতে আমি দেখেছি। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান কোন ব্যাপার নয়, ঐ বাবুরা মুসলমান চাষিদের ওপর অত্যাচার করেছে, হিন্দু চাষিদের ওপরও অত্যাচার করেছে। ঐ so called scheduled caste-দের ওপর।

আমি romantic তো একটু বটেই— এক নম্বর। আর দু'নম্বর, আমি যেটা বলতে চেয়েছি, তাকে romantic-ই বলো, আর যে-language-ই use করো, সেটা হল সভ্যতার মৃত্যু নেই। ভাঙা গাড়ি চুরমার করে জগদ্দলকে নিয়ে চলে গেল— বিমল দেখছে। যে-শিশুটি বহু দিন ধরেই inquisitive ছিল, অযান্ত্রিকের গলা তার কাছে ফিরে আসছে, সে horn-টা বাজাচ্ছে এবং লোকটা হাসছে। এই ব্যাপারটা আমার সমস্ত ছবিতেই থাকে। একে romanticism বলতে পারো— I may be romantic. সভ্যতার মৃত্যু নেই, সভ্যতা পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সভ্যতা চিরদিনের। সেখানে তিতাসে ধানের ক্ষেত জন্মেছে, সেখানে আর-একটা সভ্যতার আরম্ভ। সভ্যতার মৃত্যু নেই। মানুষ অমর, individual মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষ অমর। সে একটা থেকে আর-একটা ধাপে গিয়ে পৌঁছয়, সে কথাটাই. . . বলার চেষ্টা করেছি। I cannot end in pessimistic mood, সেটা তা হলে মিথ্যা বলা হবে।

আমি তখন প্রথমত মৃত্যুশয্যায়। কাজেই ('তিতাস') কে নিয়েছে, কে নেয়নি— তারপর যে-লেখা 'তিতাস' সম্পর্কে এখানে হয়েছে তা উড়ো-উড়ো শুনেছি। আমি পড়িওনি কিছু। তাই আমি বলতে পারব না। কারণ আমি এখানে ছিলামও না এবং কোন interest নেওয়ার মতো অবস্থাও আমার ছিল না, আমি হাসপাতালে তখন পড়ে আছি। আর এর মধ্যে লেখাও বিশেষ পাই-টাইনি, কাজেই এর সম্বন্ধে আমি বলি কী করে? কেন নেয়নি, সে সম্বন্ধে তো তোমরা বলতে পারবে। তোমরা তো এখানে উপস্থিত ছিলে। আমি তখন এখানে নেই। So how can I tell?

প্রথমে যখন আমি এখানে এসেছিলাম, তখন সত্যি-সত্যি কিছু লেখা-টেখা বেরিয়েছিল। সেগুলো পড়ে বুঝতে পারলাম যে তারা খুব ভালো ভাবে নেয়নি। তারপর সে লোকগুলোর সাথে কাজ করাকালীন আমার ব্যক্তিগত পরিচয় যখন হল, আমি দেখলাম যে তাদের more or less আমার প্রতি বেশ ভালোই attitudc, তারপর ছবি বেরুনোর পরে কেউ যদি অভিসন্ধিমূলক ভাবে কিছু করে থাকে, প্রথমত কে করেছে, কে করেনি— বললাম তো আমি কিছু জানি না, যদি করে থাকে তার উত্তর দেওয়া আমি ঘৃণ্য মনে করি। আর যদি ইচ্ছা করে না-করে, তার সত্যিই মনে হয়ে থাকে, তা হলে আমি তাকে সেলাম করি, কিন্তু এটা যদি বোঝা যায় কেউ অভিসন্ধিমূলক ভাবে কোন কিছু করছে তবে তার উত্তর দেওয়া কি উচিত? কী লাভ হবে দিয়ে?

(বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর কোন ছবি করার জন্য) কেউ যখন এখনও ডাকেনি, তখন ডাক পড়লে আসব কি না, তা ভেবে কী হবে? তা ছাড়া নিজের হাত এখন full. এই 'তিতাসে'র পুরোটা তৈরি করতে হবে তো, 'যুক্তি তক্কো গপ্পো' শেষ করতে হবে। তা আমার হাত তো at least for a month or two full. তারপরে এ দুটো ছবি কলকাতায় release করতে গেলে যথেষ্ট ঝামেলা, আমাদের দেশে director এবং বিশেষ করে কলকাতায় ছবি release-এর জন্য, তার দায়িত্ব বেশি, তাই সেই release-এর পিছনে দৌড়ও, তারপর release-এর সময় লোককে ইয়ে করো, কাজেই ঐ সব দিকে এখন concentrate করতে হবে, কাজেই immediately এখন বলে কী লাভ?

(বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার আন্দোলন) আমাকে পাগল করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন যা দেখছি, এক্কেবারে উলটো হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে আমার যোগাযোগ যত বেশি, আমার মনে হয় (তত বেশি) আর কারওই নেই। কারণ আমি ভীষণ ভাবে পরিচিত এবং তাদের সঙ্গে মিশেছি। এই মুক্তিযোদ্ধা ছেলেগুলো এখন গুণ্ডায় পরিণত হয়েছে। Typical গুণ্ডা। এরা গুণ্ডা শুধু নয়, ডাকাত। মানে ঘরে-ঘরে তো স্টেনগান... LMG... রিভলবার। এরা এখন এক্কেবারে পালটে গেছে। এটা কলকাতার কাগজে বেরোয় না। কিন্তু এগুলো, আমি তো যাই, আমি জানি। যে-ছেলেগুলোকে আমি ভালোবাসতাম, তারাই এখন এতে পরিণত হয়েছে। আর যারা তাদের মধ্যে good elements তারা completely frustrated— যে, এই কি আমাদের স্বাধীনতা? এর জন্যেই কি আমাদের তিরিশ লাখ লোক মারা গেল? দুটোই

এক। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে একটা অসম্ভব উদ্দীপনা এসেছিল, উদ্দামতা এসেছিল এবং সে সময়েও আমি ভেতরে ঢুকেছি। ছবিও করেছি ওরই মধ্যে। পাক সেনাদের সামনে। তখন দেখেছি তাদের যে-বীরত্ব। কিন্তু এখন দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা হচ্ছে complete frustration যে, এটা কি স্বাধীনতা? এই জন্যেই কি আমরা লড়াই করলাম? আর-এক দল একেবারে complete গুণ্ডা।

বাংলাদেশে ছবি তৈরির বিষয়ে কিছু বলতে গেলে আমাকে diplomat হতে হবে। দু'দেশের ব্যাপার এবং অত্যন্ত touchy ব্যাপার! অর্থাৎ কীনা আমি যদি কিছু খারাপ বলতে যাই, তা হলে সেটা আঘাত করবে তাদের। এবং তার ফলে আরও একটু মন্দ সম্পর্ক হয়ে যাবে। কাজেই বলতে চাই না। বাংলা-দেশে মোটামুটি ভাবে যেগুলো good points, সেগুলো আমি বলতে পারি। Not the bad points. বাংলাদেশে ছবি করার সুবিধে-অসুবিধের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী যে-সমস্ত ছেলেমেয়ে, তাদের কোন তুলনা নেই। তারা আপনার জন্য প্রাণ দিয়ে দেবে। Technician-দের মধ্যেও বেশির ভাগ আপনার জন্য উন্মাদের মতো খাটবে। কারণ একটা জিনিশ ওদের— সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষ ভীষণ ভাবপ্রবণ। যাকে নেয়, প্রাণ ভরে নেয়। আর যাকে নেয় না, তাকে একদম নেয় না। কাজেই এই হচ্ছে মোটামুটি ঘটনা। যন্তরপাতির অবস্থা বলে লাভ নেই— যাকে বলে একেবারে জঘন্য। এমন সমস্ত যন্তরপাতি আছে ওখানে, যা কলকাতায় নেই, বম্বেতে নেই, পুনাতে নেই। এত ভালো! কিন্তু সেগুলো এমন ভাবে ধেড়িয়েছে, মানে চুরমার করেছে একেবারে। সেগুলোকে সারাতে-সারাতে আমার জান কয়লা হয়ে গেছিল। আমাকেই মিস্ত্রি হতে হয়েছিল! কী করব?

(সেগুলো নষ্ট হয়েছে) সম্পূর্ণ অজ্ঞানতার ফলে— এক। দুই হচ্ছে, ঘুষ খাবার tendency. আর তিন হচ্ছে, complete carelessness. আমি যেমন একটা জায়গা, ঢাকা থেকে প্রায় আশি মাইল দূরে shooting করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি যখন সব তৈরি করছি, তখন আমার ক্যামেরাম্যান এসে বলল, 'দাদা, এ ক্যামেরাটা work করছে না, shutter plate move করছে না। কী হয়েছে আমি বুঝতে পারছি না।' আমি গেলাম। যে-ছোঁড়াটা caretaker হয়ে এসেছে, তার তো দায়িত্ব ছিল ক্যামেরাটাকে check-up করে studio থেকে নিয়ে আসা? এত দূর এসেছি, এতগুলো লোককে নিয়ে। এতগুলো পয়সা নষ্ট হচ্ছে। আমি গিয়ে দেখি. . . খোল। খুলে দেখি, ক্যামেরার মাঝখানে একটা pin থাকে, সে pin-টা গেছে বেঁকে। যার ফলে shutter

plate আটকে গেছে। সেটাকে ঠুকে-ঠুকে ঠিক করে আমি shooting করলাম। আবার একদিন আর-এক জায়গায়, সেটা 30 miles away from ঢাকা, ক্যামেরা নিয়ে গেছি। এখন ক্যামেরার মধ্যে নানা রকম থাকে : Type 2 অ্যারিফ্লেক্স যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে variable shutter, আর Type 1-গুলো হচ্ছে fixed shutter. এখন আমি 180 ডিগ্রি চাই, ওটা 120-তে আটকে আছে। আমার ক্যামেরাম্যান আবার এসে আমায় বলছে, 'দাদা, এটা কি আপনি চাচ্ছেন variate করতে? এটা variate করা যাবে না।' আমি care-taker-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরে ব্যাটা, কী ব্যাপার এটা?' বললে, 'এটা 120 তো, fixed shutter.' আমি বললুম, 'শালা, এটা Type 2 best camera.' খুললাম, jam করে রেখে দিয়েছে, মানে হয়ে গিয়েছে আর কী! মানে overhaul করেনি, মানে keep up একদম করেনি। তা, I have to correct, then shoot. তা এ রকম ঝামেলা। আর sound system? সে horrible. সে ভাবা যায় না! সে মানে, হাত দিলে ভেঙে পড়ে। সে সব মাল দিয়ে আমাকে sound-এর কাজ করতে হয়েছে। Anyway, কিন্তু বেশির ভাগ মানুষ অসম্ভব ভালো। এই হচ্ছে ঢাকার অবস্থা।

(বাংলাদেশে) ছবি না-হওয়ার কারণ হচ্ছে যে পঁচিশ বছর ধরে তোমাদের দরজায় কুলুপ দিয়ে রাখা ছিল। কিস্‌সু দেখতে, শিখতে কিংবা পড়তে দেওয়া হয়নি। Somehow this has happened. হঠাৎ দরজা খুলেছে। এখন এই সুযোগটা গ্রহণ করা তোমাদের উচিত, যে করে পারো Film society movement করার সাথে-সাথে একটা পাঠাগার তৈরি করো। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফিল্ম সম্পর্কে বই, ম্যাগাজিন এবং classic বইগুলো যোগাড় করে নিজেরা পড়াশোনা করো। আসল জিনিশটা হচ্ছে যে, serious attitude-টা develope করা উচিত। কিন্তু attitude develope করতে যেটা আমরা করেছিলাম, সেটা হচ্ছে পড়াশোনা। কারণ আমাদের কারওরই মুরোদ ছিল না ছবি করি বা বিদেশের ছবি দেখি। ঠিক এই অবস্থা ছিল কলকাতার, তা ১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত। ১৯৫০-এ শুরু হল আমাদের World classics এবং অন্যান্য ভালো ছবি দেখা, যদিও Film society আন্দোলন (Calcutta Film society) শুরু হয়েছে '৪৮ থেকে। তার আগে আমরা কী করেছি? আমরা তার আগে কোথায় আইজেনস্টাইন-এর 'Film Form', 'Film Sense', পুদভকিন-এর 'Film technique and Film acting', ক্রাকাওয়ে-র এবং পল রথা-র বই যোগাড় করে, রজার মেনভিল-এর বই যোগাড় করে, পড়ে বোঝবার চেষ্টা করে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েছি, তারপর ছবি পেয়েছি এবং দেখেছি। আমাদের

এই চেষ্টাটা film industry-র completely বাইরে ছিল। আমরা সকলেই film industry-তে জড়িত ছিলাম। যেমন আমি assistant director ছিলাম, গল্প-লেখকও ছিলাম, আবার acting-এও ছিলাম। কিন্তু সেটা ছিল একটা দিক। কারণ ওখানে এ সব কথা বললে হাসত আজকের মতো। একই, কোন তফাত নেই। নিজেদের individual চেষ্টায় বা বন্ধুবান্ধবরা কয়েক জন মিলে এদিক-ওদিক করতে-করতে এক-আধটা বই নিয়ে পড়ে, আলোচনা করে বোঝবার চেষ্টা করো। এই করতে-করতে বছরখানেক বা বছর-দুয়েকের মধ্যে একটা আন্দোলন দানা বাঁধবে। তখন society তৈবি করার একটা অবস্থা তৈরি হয়। ভালো ছবির movement-টা এই commercial world-এর বাইরে করতে হয়। পরে commercial world-এ তার effect পড়ে এবং সেখানে আঘাত করার প্রশ্ন আসে। কিন্তু আঘাতটা করবে কে? অপ্রস্তুত সেপাই কতকগুলো— হাতে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার— তারা তো আর করতে পারবে না, তাদের তো complete mental preparation থাকা উচিত।

(উভয় বাংলার যৌথ প্রযোজনায় চলচ্চিত্র সৃষ্টি) করা উচিত। যত বেশি পারা যায় যৌথ প্রযোজনায় ছবি করা উচিত। আদান-প্রদান হওয়া উচিত। যাওয়া-আসা উচিত, মেশা উচিত। এটা তোমাদেরই করতে হবে। পৃথিবীর কোন দেশেই সম্পূর্ণ ভাবে আশা করা যায় না যে, এ সমস্ত ব্যাপারে সরকারি আমলাদের সাহায্য পাওয়া যাবে। কোন জায়গায় কোন film society, কোন film movement, কোন art movement কোন দিন bureaucrat-দের দিয়ে হয়নি। তোমরা একটা চেহারা করে পাঠাবে, আবার তারা ওখান থেকে একটা চেহারা করে পাঠাবে। এ চলবেই, এগুলো inevitable. কতকগুলো ব্যাপার— তোমাদের দল বেঁধে যাওয়া উচিত কলকাতায়, গিয়ে ঘুরে দেখা উচিত। কিছু বই পড়া উচিত, মেশা উচিত। আবার ওখান থেকে ছেলে-পেলের এখানে আসা উচিত। ঠিক same. আর একটা পথ হচ্ছে ঐ joint production. এখান থেকে কিছু ছেলে, কিছু কর্মী এল, তোমরা কিছু জুটলে। ঠিক এগুলোই হওয়া উচিত। কিন্তু এগুলো করার জন্য যদি মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকো (তো হবে না)। নিজেদের মধ্যে জোর আনতে হবে, পরে সরকারকে convince করতে হবে। যেমন Indian Government এখন আর এই media-র গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। যার জন্য FFC তৈরি করতে হয়েছে, Film Institute তৈরি করতে বাধ্য হতে হয়েছে। কিন্তু তার আগে কত বছরের চেষ্টায় তাদের মনে এই seriousness-টা ঢোকাতে

হয়েছে, নইলে প্রথম দিন বললে কেউ দিত নাকি? '৪৮-এ কেউ ভাবতে পারত নাকি যে সরকার টাকা দিচ্ছে, ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে ফিল্ম-কে?

বাংলাদেশের একটাই ছবি দেখেছি আমি— 'জীবন থেকে নেয়া'। হ্যাঁ, 'ওরা এগারজন'ও দেখেছি। এই দুটো ছবি দেখে আমি বাংলাদেশের ছবি সম্পর্কে কী বলব? 'জীবন থেকে নেয়া' আমি কলকাতায় দেখেছি। ও সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায় যে তখনকার অবস্থায় এমন একটা ছবি এখানে বসে করা, এর জন্য বুকের পাটা দরকার। ছবির content-এর দিক থেকে বলছি। Form বা structural ব্যাপার, এ সমস্ত আমি আলোচনাই করছি না। ওখানকার যে-অবস্থা ছিল তার মধ্যে একটা ছেলে এ রকম bold ভাবে কাজ করতে পারে, সেটা অভিনন্দনযোগ্য। আর 'ওরা এগারজন'— ঠিক আছে।

(বাংলাদেশের ছবির ভবিষ্যৎ) খুব ভালো। এটা হচ্ছে ধাক্কার ব্যাপার। আবার বলছি, ধাক্কার ব্যাপার। এখন যা দেখছি তাতে হতাশার শেষ, চূড়ান্ত। কিন্তু হতাশ হওয়ার কোন ব্যাপার নেই। চার-পাঁচটা ভালো ছবি যদি বাংলাদেশ থেকে বেরোয় তা হলে নতুন ছেলেদের মধ্যে অনেকেই আছে, আমি যাদের জানি, তারা সাহস করে এগোবে। FFC যদি তাদের সাহায্য করে এবং যদি তারা তার উপযুক্ত হয়— হবেই, আমার হতাশার কোন কারণ নেই।

(যে-ভাবে বাংলাদেশে ছবি distribute করা হচ্ছে বা produce করা হচ্ছে সেটা) খুবই বেঠিক। কিন্তু সেই বেঠিকটাকে আস্তে-আস্তে ঠিক করার চেষ্টা চলছে। নানা রকম হচ্ছে-টচ্ছে, জানি না তার ফল কী দাঁড়াবে। distributor কেউ না, আসলে ছবি control করে exhibitor-রা। চার-পাঁচ বছর আগেও এরাই ছিল কর্তা। এরা বলত যে, বাব্বা, ফিল্মে টাকা দেব? এরা প্রথম টাকা পেত। কাঁচা টাকা। টাকা না-পেলে লোকে ঢুকতে পেত না। কিন্তু ফিল্ম ব্যবসায় টাকা দেব না।

('যুক্তি তক্কো') যখন লেখা তখন দুই বাংলার ব্যাপার এসে গিয়েছিল, সে সময় আমি সদ্য সদ্য ও-বাংলায় ঢুকে পড়ে খানিকটা চোখে দেখে এসেছি।

('দুর্বার গতি পদ্মা') ছবিতে অবশ্য কিছুই তুলতে পারিনি, তোলা যায়নি, সম্ভবপর ছিল না, শুধু চোখে দেখে এসেছি। মনের মধ্যে এমনিই একটা semi-romantic ভালোবাসা, তারপর সদ্য-সদ্য ঐ সব দেখে এসে ঐ '৭১-এর জুন মাসে এ ছবির script লিখতে বসেছি— কাজেই ঐ দুই বাংলার

ছোঁয়া এখানে আছে। তবে '৭৩-এর শেষে গিয়ে, '৭৪-এ যদি ছবি release করে, '৭১-এর চিন্তাটা যাতে backdated না হয়ে যায়, তার জন্য কিছু রদ-বদলের প্রয়োজন আছে, সেটা করা গেছে। ছবি শেষ না-হলে এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার মানে হয় না, ছবি শেষ হোক, তার পরে. . .

(এ ছবিতে) বলতে আমি কিছুই চাইছি না, বলতে কী চাইছি তা ছবি দেখে বুঝবেন, বলে দিলে মজা নষ্ট। নিজেদের মতো করে বুঝে নেবেন। রবি ঠাকুরের কবিতা পড়ে রবি ঠাকুর যা ভেবে লিখেছিলেন, আপনি তো তা ভাবেন না, আপনি নিজের রস দিয়ে একটা কিছু করে নেন।. . .

ও-সব (আত্মজীবনী)মূলক-ফুলক নয়। ঐ সময়ে আমার জীবনে যা ঘটে গেছে, ঐ '৭১-এ, সেখান থেকেই ছবির starting point. আর ঐ মাতাল অবস্থায় '৭১-এর গোড়ায় কলকাতার রক-এ বসে কলকাতাটাকে খুব ওত-প্রোত ভাবে দেখা গিয়েছিল। False হোক আর true হোক, আমার যেহেতু একটা status আছে, তাই বড়লোকেদের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাদের reaction-গুলোও আমি দেখেছি, তাই আমি সমাজের প্রতিটি স্তরকে কেটে দেখা এবং দেখানোর চেষ্টা করেছি, সমস্ত মানুষ কী ভাবে react করেছিল সে সময়, সালতামামি গোছের আর কী। Starting point, আরম্ভটা শুধু আমার জীবনের কিছু ঘটনা দিয়ে।

ছবির নাম হচ্ছে 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো', 'Arguments and a Story'. তোমাদের গল্প না-হলে ভালো লাগে না, তাই একটা গপ্পো দিচ্ছি। আসলে এটা যুক্তি-তর্ক, it is completely a political film.

মোদ্দা কথা হচ্ছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকা তখন যা ছিল, তা যে-ভাবে আঘাত করেছিল শহরের মানুষকে, শহরের মানুষ শুধু না, এ ছবিতে আমি গ্রাম-বাংলাতেও গেছি, তা বেশির ভাগই আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা। এ দিক থেকে এ ছবিকে কিছুটা ব্যক্তিগত, আত্মচরিতমূলক বলা যায়, তবে আত্মচরিতমূলক বলতে যা বোঝায়, এ ছবি সে ধরনের নয়। যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা পেরেছি, ছবিতে তা বলার চেষ্টা করেছি। 'যুক্তি তক্কো' নিয়ে বেশি প্রশ্ন করবেন না। ছবি শেষ হোক, ছবি চলুক, তারপর তর্কাতর্কি করা যাবে।

আমার মনে হয়েছে আমাদের জীবনে একটা অভাব ঘটেছে, সেই অভাব-বোধকে যদি জাগ্রত করতে পারি, সেটাই কি যথেষ্ট নয়? কিন্তু আমি slogan mongering-এ বিশ্বাস করি না, তাই আমি এ ছবিতে কোথাও slogan

দিইনি। আমি খালি জিনিশটাকে তুলে ধরেছি— such is the present-day Bengal. এখন তোমরা যদি এটা নিয়ে একটু ভাবো, এই ছবি যদি তোমাদের ভাবায় যে way out কী— তা হলেই আমার সার্থকতা।

আমি Surrealism-ফিজম বুঝি না বাবা, আমার ইচ্ছে হয়েছে, করেছি।

আমি বাপু বলতে চেয়েছি ভূতের নৃত্য চলছে গোটা বাংলাদেশে।

(স্থবির ভদ্রলোক ভারতবর্ষ, সে) অপেক্ষা করছে, তোমরা নাচন-কোঁদন কীর্তন করে যাচ্ছ, যে যার কোলে ঝোল টানার চেষ্টা করছ, all political leaders. এবং এই ভূতের নৃত্যের জন্য তুমি এবং তোমরা দায়ী, এটা বার-বার বলা হয়েছে। Dancing figure-গুলোর আঙুল তোমাকে সব সময়েই point out করছে— you are responsible. একে তোমরা Surrealism বলো আর যা-ই বলো, আমি ঐ সব ism-ফিজমের মধ্যে নেই। আমার যা ভালো লেগেছে, তা-ই করেছি।

আমি তো মনে করি. . . এগুলোকে ধরা উচিত, কারণ আমি চোখের ওপরে দুঃখের কটাক্ষ তো দেখছি।

Optimism-টপটিমিজম বুঝি না। মোদ্দা বাংলা হচ্ছে— এই হচ্ছে যুক্তি-তক্কো-গপ্পো। একে যদি তোমরা political বলো তো political, non-political বলো তো non-political, but no পার্টিবাজি। Universal con-demnation. আমার কিছু বক্তব্য নেই। I am not a political man, আমি politics করি না। কাজেই কোন পার্টি করি না। কিন্তু চারপাশে আমি reality দেখছি তো।

('যুক্তি তক্কো'কে ব্যতিক্রমেরও ব্যতিক্রম ইত্যাদি). . . কিসুই মনে হয় না। এটা হচ্ছে একটা সম্পূর্ণ অন্যদের মতামত। আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি করেছি।. . . কী হয়েছে আর কী হয়নি, সেটা আপনাদের ব্যাপার। আমি কী করে বুঝব? শিল্পীর কাছে কখনও জিজ্ঞেস করবেন না তার কাজ সম্বন্ধে। কারণ সে always biased. তাকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। এটা আপনাদের reaction— কারওর কাছে ভালো লাগবে, কারওর কাছে খারাপ লাগবে, কেউ চটবে, কেউ খুশি হবে। আমার কী? আমি যা করার করেছি।

প্রত্যেকটি শিল্পকর্ম আলাদা। এখন প্রত্যেক শিল্পের যে-ভঙ্গি সেটা জন্মগ্রহণ করে তার theme থেকে, তার চিন্তাদর্শন থেকে। তা এই particular ছবিতে

গেছি। একেবারে মানুষ ক্ষেপে ব্যোম। তারপরে '42 August Movement. সেটা shake করেছিল। তারপরে Naval Movement বোম্বেতে। তারপরে মাদ্রাজে Air force-এর mutiny. সেটা কেউ জানে না। চাপা, একেবারে চেপে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। ওদের একেবারে complete shaking condition ছিল তখন। আমরা যদি আর কয়েক দিন লড়াই করতে পারতাম, চেঁচামেচি করতে পারতাম এবং কয়েকটা প্রাণ দিতে পারতাম, এরা এমনি ছাড়তে বাধ্য হত। কিন্তু এই মাউন্টব্যাটেন-এর সঙ্গে ইয়ে করে যে গদি পাওয়া, মানে একটা, নিজেদের মধ্যে একটা pact করে, এই country-র সমস্ত National Liberation Struggle-টাকে betray করল। গান্ধি was against it. (কিন্তু) আমাদের National Liberation Struggle-এর higher group Independence -এর নাম করে গদিতে বসে গেল। সেইটেই বলেছি। এটা আগেও বলেছি, আজও বলছি। এবং চেঁচিয়ে বলি, সব জায়গাতে বলি।

('যুক্তি তক্কো' political ছবি) সম্পূর্ণ ভাবে। Political ছবি করা আসলে মেরুদণ্ডের প্রশ্ন।

Politics কি জীবনের বাইরে? ১৯২৮ সালে চ্যাপলিন মস্কোয় বলেছিলেন, I am interested in man. Politics is a part of man. ফিল্ম apolitical— কোন শিল্পী এ কথা বলে না। প্রশ্নটাই রাজনীতিভিত্তিক। শ্লেসিঙ্গার-এর মতে politics ছাড়া উচিত শিল্পীর— কিন্তু এটাই political কথা।

(চলচ্চিত্র প্রতিবাদী) পরিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু নির্ভর করছে যে-ব্যক্তি ছবি করছে, তার ওপরে। তার যদি শিরদাঁড়া খাড়া থাকে, সে সব কিছু করতে পারে। মানবজগতের সমস্ত সমস্যাবলি শিল্পী ছবির সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সে যদি না-করে, তা হলে করণীয়টা কী? এটা করা হয় না সাধারণ ভাবে, কাজেই আমাদের ছবি এত হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় কোন ছবিতে কোন প্রতিবাদ আছে কি নেই, প্রাথমিক ভাবে এটা আমার জানা সম্ভব নয়। কারণ, (আগেই বলেছি) আমি ভারতীয় ছবি একদম দেখি না। আর যেটুকু শুনেছি মানুষের কাছ থেকে, তাতে আমার ধারণা যে কোন প্রতিবাদ নেই। এরা মানুষকে মোটামুটি ভাবে অন্য দিকে নিয়ে যেতে চায়। মেনটেনবার্গ. . . (ওয়) বইটা আপনারা পড়েছেন কি না আমি জানি না। আমি আপনাদের অনুরোধ করব পড়তে। Dream factor-এর, মানে

গেছি। একেবারে মানুষ ক্ষেপে ব্যোম। তারপরে '42 August Movement. সেটা shake করেছিল। তারপরে Naval Movement বোম্বেতে। তারপরে মাদ্রাজে Air force-এর mutiny. সেটা কেউ জানে না। চাপা, একেবারে চেপে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। ওদের একেবারে complete shaking condition ছিল তখন। আমরা যদি আর কয়েক দিন লড়াই করতে পারতাম, চেঁচামেচি করতে পারতাম এবং কয়েকটা প্রাণ দিতে পারতাম, এরা এমনি ছাড়তে বাধ্য হত। কিন্তু এই মাউন্টব্যাটেন-এর সঙ্গে ইয়ে করে যে গদি পাওয়া, মানে একটা, নিজেদের মধ্যে একটা pact করে, এই country-র সমস্ত National Liberation Struggle-টাকে betray করল। গান্ধি was against it. (কিন্তু) আমাদের National Liberation Struggle-এর higher group Independence -এর নাম করে গদিতে বসে গেল। সেইটেই বলেছি। এটা আগেও বলেছি, আজও বলছি। এবং চেঁচিয়ে বলি, সব জায়গাতে বলি।

('যুক্তি তক্কো' political ছবি) সম্পূর্ণ ভাবে। Political ছবি করা আসলে মেরুদণ্ডের প্রশ্ন।

Politics কি জীবনের বাইরে? ১৯২৮ সালে চ্যাপলিন মস্কোয় বলেছিলেন, I am interested in man. Politics is a part of man. ফিল্ম apolitical— কোন শিল্পী এ কথা বলে না। প্রশ্নটাই রাজনীতিভিত্তিক। শ্লেসিঙ্গার-এর মতে politics ছাড়া উচিত শিল্পীর— কিন্তু এটাই political কথা।

(চলচ্চিত্র প্রতিবাদী) পরিপূর্ণ হতে পারে। কিন্তু নির্ভর করছে যে-ব্যক্তি ছবি করছে, তার ওপরে। তার যদি শিরদাঁড়া খাড়া থাকে, সে সব কিছু করতে পারে। মানবজগতের সমস্ত সমস্যাবলি শিল্পী ছবির সাহায্যে প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সে যদি না-করে, তা হলে করণীয়টা কী? এটা করা হয় না সাধারণ ভাবে, কাজেই আমাদের ছবি এত হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতীয় কোন ছবিতে কোন প্রতিবাদ আছে কি নেই, প্রাথমিক ভাবে এটা আমার জানা সম্ভব নয়। কারণ, (আগেই বলেছি) আমি ভারতীয় ছবি একদম দেখি না। আর যেটুকু শুনেছি মানুষের কাছ থেকে, তাতে আমার ধারণা যে কোন প্রতিবাদ নেই। এরা মানুষকে মোটামুটি ভাবে অন্য দিকে নিয়ে যেতে চায়। মেনটেনবার্গ. . . (ওয়) বইটা আপনারা পড়েছেন কি না আমি জানি না। আমি আপনাদের অনুরোধ করব পড়তে। Dream factor-এর, মানে

সম্পূর্ণ support-এ এ রকম, মেনটেনবার্গ-এর লেখার মতো এত ভালো লেখা আর কোথাও নেই। 'Thoughts on Film' বইটা। আপনারা পড়ুন— 'Thoughts on Film'. এ চূড়ান্ত বদমাইশির শেষ কথা। আমাদের দেশে— আমি কারও নাম বলতে চাই না— কিন্তু মোটামুটি ভাবে এঁর বই এরা কেউ পড়েওনি বোধ হয়। আমি পড়েছি, কারণ আমাকে পড়তে হয়। এরা সব ঐ level-এ move করছে। আমাদের দেশে প্রতিবাদ-ফ্রতিবাদের কথা বলার সাহস কারওরই নেই। এক মৃণাল সেন খানিকটা চেষ্টাচরিত্তির করছে-টরছে। এবং সেগুলোও আমার কাছে মনে হয় না কোন গভীরে পৌঁছেছে। কারণ, আমাদের দেশের মানুষের যে-দুঃখদুর্দশা, ছবির কাজ হচ্ছে— ছবি কেন, সব শিল্পের কাজ হচ্ছে, সেইটেকে তুলে ধরা। সেটা মৃণাল কতখানি তুলতে পেরেছে জানি না। আমার বলার কোন অধিকার নেই, কারণ এরা প্রত্যেকেই আমার বন্ধু। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে, আর এ কাজে আর একটা লোকেরও নাম আমি করতে পারছি না যে কিছু করতে পেরেছে। এই হল কথা। আমি নিজেও বেশ কয়েক দিন কাজকম্ম করিনি। এখন করছি। এর চেয়ে বেশি বলার অবকাশ আমার নেই।

(পরের ছবি নিয়ে) ভাবছি, জানি না কী হবে— কী বলব, এখনও তো কিছু ঠিক হয়নি। বছরখানেক আগের একটা সত্য ঘটনা— নবদ্বীপের একটি মেয়ে, বিষ্ণুপ্রিয়া, দারুণ contrast ঐ নবদ্বীপেই সেই নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া, তার অপরাধ সে রূপসী এবং গরিব ঘরের মেয়ে। কয়েক জন মস্তান তার পেছনে লাগে এবং সে আত্মহত্যা করে। এটুকুই কাগজে বেরিয়েছিল, কিন্তু যেটা বেরোয়নি, সেটা আমি একজন সাংবাদিকের কাছে জেনেছি, সে ওখানেই থাকে। মেয়েটি মোটেই আত্মহত্যা করেনি, she was raped and burnt to death. এই আমার গল্প, এই আমার ছবি।

(পরের ছবি) ভেবেছি, তবে সেটা তো ব্যবসা, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে খানিকটা ভেবেছি। বছর-দেড়েক আগে কী বছরখানেক আগে, আমার ঠিক মনে নেই . . . আমি তখন হাসপাতালে, কাগজে পড়লাম নবদ্বীপের পাশে, তার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া. . .। তাকে পাড়ার ঐ wagon-breakers. . . যারা সব নয়া কংগ্রেস হয়েছেন. . . পাইপগান ইত্যাদি. . . তারা chase করতে আরম্ভ করে. . . মেয়েটার দোষের মধ্যে দোষ যে সে একটা বামুনের মেয়ে, কাজেই এই গ্রাম ছেড়ে যাবার উপায় নেই। দ্বিতীয় কথা, সে দেখতে সুন্দরী। সুন্দরী মেয়ে, এই আর-একটা দোষ। এই ছোঁড়াগুলো পেছনে লেগেছে. . . ঐ সব

supposed to be নয়া কংগ্রেস. . . তো ultimately মেয়েটা— এই সব কাগজে বেরিয়েছে, সব কাগজেই আমি পড়েছি যে, এই ছোঁড়াগুলো chase করতে-করতে মেয়েটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গেল যে মেয়েটা বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একটা ভালো শাড়ি পরে আসি, তার পর . . . ভেতরে ঢুকে সে পেছনের ঘর দিয়ে বেরুবার চেষ্টা করেছিল. . . তারপরে এই ছোঁড়ারা ধরে. . . and they enjoyed her. পর-পর ৪-৫টা ছেলে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে. . . এরই মধ্যে 'সত্যযুগ'-এর রিপোর্টার ছেলেটা— সে ঐ গ্রামেরই ছেলে— সে গিয়ে পৌঁছেছে। সেই শুনে এরা আগুন লাগিয়ে. . . মেয়েটাকে কেরোসিন দিয়ে পুড়িয়ে মারে। ঐটার ভিত্তিতে আমি একটা ছবি করব। (লোকেশ ঘটককে নির্দেশ করে) ওকে দিয়েছি আমি লিখতে। This is a fact এবং সেটা কাগজেও বেরিয়েছে। 'সত্যযুগ'-এ তো খুব ভালো করে বেরিয়েছে ঐটের ওপরে।

(এর সঙ্গে অতীতের বিষ্ণুপ্রিয়ার যোগাযোগ আছে) naturally. চৈতন্য-দেবের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। তিনি সর্পদষ্টা হয়ে মারা যান। তারপর ছোট বোনকে বিয়ে করেন. . . ঐখানেই চৈতন্যদেব। আর চৈতন্যদেব, as you know যে, সারা বাংলায় তাঁর influence 15th century-তে. . . তাঁর পাশে তো দাঁড়াবার কেউ ছিল না! তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। এবং as luck would have it, ঠিক সেই গ্রামেই আর-একটা বিষ্ণুপ্রিয়া আজকে মারা গেল। যে-গ্রাম, আপনারা. . . যে-কোন গ্রামে যান, শুনতে পাবেন যে, 'শচীমাতা গো আমি যুগে-যুগে হই জনমদুখিনী।' এটা আমার বাংলার যে-কোন গ্রামে আপনি ঢুকলে পাবেন। ওটার সঙ্গে cross reference আমি যেগুলো করব (লোকেশ ঘটককে নির্দেশ করে) ও জানে না হয়তো। ওকে এমনি just একটা rough sketch করতে দিয়েছি। দেখুন, নব্যন্যায় তখন বাংলায় সবে জন্মগ্রহণ করছে। ঐ নবদ্বীপের ঘাটে। সেই সময়ে নবদ্বীপে ছিল একেবারে brilliant intellectuals. একটা নয়, একশোটা। মহাপণ্ডিত, মহাশিক্ষিত। এঁরা ছিল তখন, ঐ নবদ্বীপের ঘাটে বসত। আলোচনাগুলো সব ঘাটে বসে হত। তার মধ্যে নিমাই সন্ন্যাসী একজন ছিল। হ্যাঁ, সে, জীবন, কানা রঘুমণি, তিনি স্মার্ত পণ্ডিতের শেষ. . . স্মৃতির শেষ কথা সে বলে গেছে। এই সমস্ত পার্টি. . . তো ঐগুলোকে intercut করব— আজকের এই জীবন আর তার সঙ্গে ঐ জীবন, দুটোকে পাশাপাশি রাখব। এই মোটামুটি আমার মাথার মধ্যে আছে। লিখতে হবে ভালো করে। ন্যায়, নব্যন্যায়। যেটা একমাত্র বাংলার contribution. (কিন্তু) এ বার সারা ভারতবর্ষে এখন চলছে এ সবগুলো. . . এই সব আর কী। আর বেশি বলে লাভ কী?

ছবি, আমার মতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু সেটাকে সেই ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে কি? যা হচ্ছে, সেটা আপনারা সকলেই জানেন। এ নিয়ে আলোচনা করার কোন বিশেষ অবকাশ নেই। ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের, এ দেশের, সবচেয়ে শস্তা আমোদের উপকরণ। কাজেই, এ দেশে ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি যথেষ্ট উৎকণ্ঠিত। কী হবে, আমি বলতে পারি না।

(মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের) 'চিহ্ন' আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা। যদি পয়সাকড়ি পাই, কারণ ব্যবসাদারদের ব্যাপার। 'চিহ্ন' কেউ মনেও রাখে না আজকের যুগে, কেউ মনেও রাখে না। আর বিভূতিবাবুর. . . সেটা অবিশ্যি একবার বহু আগে আমারই এক বন্ধু করেছিল এবং super flop করেছিল— তার নাম আমি বলতে চাই না— (সেই) 'পুতুলনাচের ইতিকথা' করারও ইচ্ছে আছে. . . হ্যাঁ, মানিকবাবুর, স্যরি, ভুল করেছি। বিভূতিবাবুরও লেখা করার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল। উনি যখন লিখছিলেন এবং 'প্রবাসী'তে মাসের পর মাস ছাপা হয়ে বেরচ্ছিল, সেটা অন্য একজন লোক করে ফেলেছে— 'আরণ্যক'। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছা ছিল যে 'আরণ্যক' করি। বিভূতিবাবুর 'যাত্রাবদল'। আপনারা কি পড়েছেন 'যাত্রাবদল'? ওটা একটা terrific. আমি পারব কি না কোন দিন . . . কারণ, এই ব্যবসাদার লোকগুলো মাঝখানে থাকে তো, তারা অসুবিধের সৃষ্টি করে। তারা তো বোঝেন না এ সব জিনিশপত্তর!

রবিবাবুর 'চতুরঙ্গ' নিয়ে সমস্ত লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল, ব্যবসা হবার বিষয়। যে-লোকটার সঙ্গে করলাম, আমার কপাল ঠিক. . . 'চতুরঙ্গ' নিয়ে আমার কপাল সব সময় খারাপ। আর, one of the highest gentlemen in film line— এবং প্রচুর টাকাওয়ালা লোক— আমার সঙ্গে 'চতুরঙ্গে'র সমস্ত final হল। বিষ্ণু দে মশাই— কবি বিষ্ণু দে, তিনি ব্যাপারটাকে পাকা করে দিলেন! কারণ, বিষ্ণু দে-রই ছাত্র তিনি, হেমেন গাঙ্গুলী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত. . . আমি করতে পারিনি। রবিবাবুর 'চতুরঙ্গ'টা আমার. . . রবিবাবুর প্রায় প্রত্যেকটা উপন্যাসই তো ন্যাকা-ন্যাকা উপন্যাস, মানে অত্যন্ত বাজে class-এর, ভদ্রলোক তো উপন্যাস লিখতে জানতেন না। হ্যাঁ, কিন্তু ঐ 'চতুরঙ্গ'টা একটা ফাটিয়েছিলেন। মানে অনবদ্য বললে আর কী হবে! মানে, বাংলাভাষায় মাত্র চারটে উপন্যাসের মধ্যে একটা, ঐ ঐটি। 'চতুরঙ্গে'র দামিনী, জ্যাঠামশাই, শ্রীবিলাস ইত্যাদি-ইত্যাদি— এ মানে ভাবাই যায় না! তো ঐটে আমি লিখে-ফিকে ready করলাম। (কিন্তু) হেমেনবাবু পটলি-fied, মানে পটল pluck করলেন। কী করা যাবে আর!

মানিকবাবুর 'পুতুলনাচের ইতিকথা' আর রবিবাবুর 'চতুরঙ্গ', বঙ্কিমবাবুর 'রাজসিংহ' যাকে বলে সত্যিকারের উপন্যাস। আর-একটা হচ্ছে তারাশঙ্করদার— সে ভদ্রলোকও মারা গেছেন— 'গণদেবতা'। এই ক'টা। আর বাংলাসাহিত্যে কোন উপন্যাস-টুপন্যাস বলে কোন পদার্থ নেই। এই সব বেচছে, চলছে। চিরকাল যা মেয়েরা দুপুরবেলায়, গ্রীষ্মের দুপুরে, গা আদুড় করে, স্বামীকে বাজারে পাঠিয়ে, কী অফিসে পাঠিয়ে, উপুড় করে বালিশ নিয়ে দুপুরবেলা ঘুমুবার জন্য পড়ে, এই মানে খাওয়া-দাওয়ার পরে— এই তো এখনকার লেখা চলছে, বাওয়া!. . . 'আরণ্যক' সেই level-এ পৌঁছয়নি। 'আরণ্যক' উচ্ছ্বাসে ভর্তি! এই চারটে উপন্যাস, right, মাপা ব্যাপার। মানে সাহিত্যিক দিক থেকে এ চারটের ওপরে আর নেই।

ইচ্ছে আছে প্রেমেন্দ্র মিত্র-র 'সংসার সীমান্তে' গল্পটি নিয়ে একটি ছবি তোলার। এই গল্পের নায়ক একজন চোর, নায়িকা একটি বেশ্যা। তাঁরা কেউই ছোটবেলার থেকে জীবনে কোন দিন ভালোবাসা পায়নি। জীবনের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে এখানে এসে পৌঁছেছে। হঠাৎই এদের দেখা, এবং ক্রমে আবিষ্কার করে যে মানুষে-মানুষেও ভালোবাসার সম্পর্ক হয়! যা ওদের আগে জানা ছিল না। ওরা সৎ হওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় ওরা হতে পারল না, চোর চোর-ই থেকে গেল, বেশ্যাও বেশ্যা থাকল। ছবি শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত কিছু বলা যায় না কেমন হবে, কেননা মধ্যেকার এতটা সময় ও এত সব ঘটনা (যা ঘটবে) তা সবই তো আমার হাতের মধ্যে নয়।

এ ছাড়া বিভূতিবাবুর 'আরণ্যক' কিনে রেখেছি। Script-ও তৈরি। সুযোগ পেলে করব। আর প্রমথেশ বড়ুয়ার দেশ গৌরীপুরে, ওখানকার জঙ্গলের মানুষের শিকারি-জীবন নিয়ে একটি ছবি করার ইচ্ছে আছে। এ গল্পটা আমার নিজের। দেখা যাক, কত দূর কী হয়, কেননা সবই নির্ভর করছে আমাদের প্রযোজকদের ওপর।

'বগলার বঙ্গদর্শন' একটা হালকা mood-এর ছবি হবে। ইতালিয়ান লেখক ব্লাসেত্তি-র লেখা গল্প বাংলায় adapt করেছি। বেশ খানিকটা হয়ে আছে। বাকিটা নানা কারণে শেষ করা যায়নি। তবে শেষ করার ইচ্ছে আছে।

আমার ছবিতে আমি চরিত্রগুলোকে পার্থিব জগতের সঙ্গে যুক্ত করে রাখি, ছোঁয়া দিয়ে আটকে রাখি— তার পরে কিন্তু তারা এক-একটা চিন্তাগত ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করে।

যে-কোন একটা ছবির প্রসঙ্গ এলে আমি বলতে পারব— এই এখনই যে-ছবিটা তোমরা দেখে এলে, 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'— এ ছবিতে শাঁওলির চরিত্র তো ঠিক বাস্তব চরিত্র নয়, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার নাড়ির যোগ সম্পূর্ণ, at least আমার তো তা-ই ধারণা। তারপর এই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আমি সারা বাংলাদেশটা প্রতিভাত করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের দেশের ছবিতে বাঙালি মেয়েদের সব সময়েই দেখা যায় ন্যাকা-ন্যাকা, আহ্লাদে-আহ্লাদে, পুতু-পুতু, কিন্তু বাঙালি মেয়ে তা নয়। আমি তাই এনেছি এক তেজোদৃপ্ত মেয়ে— আর তার মধ্য দিয়ে সমস্ত বাংলা-দেশের আত্মাটাকে ধরার চেষ্টা করেছি।

কথা হচ্ছে, সমস্ত ছবিতে আমি কিছু-না-কিছু ধারণা-ভাবনা একটা চরিত্র দিয়ে ফোটাতে চেষ্টা করি। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি জগৎ-বহির্ভূত কিছু করি। তা বোধ হয় করি না।

(পুরাণ, myth) এটা আমার সম্পূর্ণ অভিপ্রেত ব্যাপার। কারণ আমি মনে করি যে আমাদের দেশের যে-বিরাট store house আছে, যে-ভাণ্ডার আছে, myth, পুরাণ ইত্যাদি— তার মধ্যে যে-wisdom আছে, যে-জ্ঞান আছে, সেগুলো আজকালকার আমরা প্রায় ভুলে যাচ্ছি। আমরা সেগুলোকে আর পাত্তা দিই না, অথচ তার মধ্যে প্রচুর সত্য আছে। এবং সেগুলোকে যদি আজকের জগতের জন্য shorn of its mysticism ধরি, তবে দেখব সেগুলো জানা আজও প্রয়োজনীয়— আমি যেটুকু ঘাঁটাঘাঁটি করেছি তা থেকে এটা বলতে পারি।

আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য, তার মধ্যে ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, শ্রুতির সমস্ত অংশ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ এবং মহাকাব্য। এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করলে দেখা যায় যে আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিই বলো আর যা-ই বলো, ঐ লোকজন যাঁরা ছিলেন, তাঁরা human psychology কত গভীর ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। আজকের psychiatrist-রা আজকের যুগের psycho-analysis করতে গিয়ে সেই একই conclusion-এ পৌঁছচ্ছেন, যা ঐ প্রাচীন ব্যাপারগুলোয় আছে।

কাজেই সেটাকে টেনে বার করার একটা প্রয়োজন আছে, টেনে বার করে সেগুলোকে আজকের জগতের সঙ্গে দাঁড় করাতে হবে, এটা হল এক নম্বর ব্যাপার। আর দুই হচ্ছে যে আমি যদি সোজাসুজি একটা বক্তব্য place করতে যাই, তা হলে সেটা alien হয়ে যায়। এবং এখন সেটাই হয়ে যাচ্ছে

বলে আমার ধারণা, আমার বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছবি করছেন বড় alien হয়ে যাচ্ছেন। আমার দেশের সঙ্গে নাড়ির যোগ রাখাটা ভীষণ প্রয়োজন, আমার দেশের মানুষকে তাতে অনেক তাড়াতাড়ি convince করা যায়, অনেক তাড়াতাড়ি জয় করা যায়, কেননা এগুলো রক্তের মধ্যে রয়েছে আমাদের।

(গোটা ব্যাপারটাকে) শুধু acceptable করানোই নয়। At the same time it contains a very big amount of truth, as far as human psychology is concerned.

(আমার ছবিতে) Ideological base-টা fundamental Marxism. Marxism not in the sense of this party or that party. Marxism philosophically, psychologically— মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন— এঁদের লেখার অনেক ছোঁয়া আছে বিভিন্ন দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে। এ ছবিতেও আছে, 'যুক্তি তক্কো'তে Anti-Dühring-এর প্রচুর touch আছে। আলোচনা করলে আমি করতে প্রস্তুত। এটা completely philosophical লেখা। এই আমার basis.

আমি মনে করি, film form or any other form primarily একটা make belief. যারা ছবি দেখতে hall-এ ঢোকে, তারা কেউই বাস্তব দেখতে যায় না। তারা সাধারণ ভাবে যায় entertained হতে। তা entertain করার চেষ্টা-ফেষ্টা খানিকটা করা যেতে পারে। কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে, আমি তাদের educate করতে চাই। এবং এটা করার জন্য আমাকে যদি lots of co-incidence use করতে হয়, আমি তা করব।

লোকে জানে যে সে একটা গল্প দেখছে— লোকে জানে এটা বাস্তব নয়। Documentary যখন করব তখন পুরোপুরি documentary করব। কিন্তু যখন বক্তব্য প্রকাশ করার জন্য একটা কাহিনীর বিন্যাস করব তখন যদি আমাকে co-incidence use করতে হয়, আমি any amount of co-incidence use করতে ভয় পাই না আর melodrama-য় আমি কোন রকম ভয়ই পাই না। Melodrama হচ্ছে একটা birthright, এটা একটা form.

আমার মনে হয় এটা প্রয়োজন। লোকের যদি মনে না-হয় তো ঠিক আছে, they are at liberty to have their opinions. কিন্তু আমি মনে করি আমায় এটা করতে হবে, তা না-হলে আমার বক্তব্য সোচ্চার হবে না। বক্তব্যকে প্রকাশ করার জন্য আমি যে-কোন form, সে lyric থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু ব্যবহার করতে প্রস্তুত।

আমার ছবিতে গানের ছড়াছড়ি থাকে। আমার বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছবি করেন, তাঁরা ছবিতে গানের ব্যবহারটা খুব নফরৎ করেন, গান-টান ব্যবহার করেন

না। আমি করি এবং গান দিয়ে যদি আমার বক্তব্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তো ব্যবহার করব। সোজা কথা আমার হাতে যা অস্ত্র আছে আমি তা-ই ব্যবহার করব।

আমি অনুভব করেছি ওভাবে ও-কথাটা বলা দরকার, তা-ই করেছি। আমি ওভাবেই বলেছি, সব ছবিতে বলেছি। তোমাদের একটা কথা বলছি, তোমরা যে-কোন serious filmmaker-কে তার কাজ analyse করতে বলো, সে পারবে না, পারার চেষ্টা যদি সে করে তা হলে জেনে রাখো সে গুল মারবে। কতকগুলো subconscious ব্যাপার কাজ করে, কতকগুলো unconscious. . . একটা অন্ধ আবেগ, একটা passion, একটা blind urge . . . সেটাকে পরে অঙ্ক কষে অনেক কিছু বানিয়ে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, actually আমি যখন ও-সব করেছি তখন অত ভেবে কিছু করিনি। মনে হয়েছে এটা দরকার, করেছি। এই জিনিশগুলোকে সমালোচনার অংশ হিশেবে যিনি স্রষ্টা তাঁকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। সব শিল্পকর্ম, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ থেকে আরম্ভ করে যে-কোন sincere শিল্পকর্মের পেছনে একটা blind urge, একটা অন্ধ আবেগ কাজ করে।

কাজেই ও-সব কথা আমাকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। আমি বলতে পারব না। আমি যদি মিথ্যেবাদী হই তো বানিয়ে অনেক বড়-বড় কথা বলতে পারি। আমি বাপু ও-সব ভেবে করিনি, মনে হয়েছে ওটা দরকার, করেছি। এই জিনিশটা না-থাকলে, এই freedom না-থাকলে, নিজের mind-কে completely free access না-দিলে শিল্পসৃষ্টি mechanical হয়ে যায়, নিতান্ত কেরানি-মার্কা মাজাঘষা কাজ হয়— তাতেও ভালো কাজ হয়তো হয়, আমি জানি না। কিন্তু সত্যিকারের দরদ তাতে থাকে না। সত্যি-সত্যি যদি দরদ থাকে তো অনেক জায়গাতেই অত ভেবেচিন্তে কিছু করা যায় না। মনে হয়েছে— করেছি, finish, এখানে আর বেশি কিছু বলার নেই।

(ইয়ুং-এর তত্ত্ব মার্কসবাদের) সম্পূর্ণ পরিপূরক। ইয়ুং-এর তত্ত্ব যদি তোমরা পড়াশোনা করে থাকো, I hope you have read, তা হলে দেখবে ইয়ুং-এর তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের কোন গণ্ডগোল নেই। মার্কস একটা জগৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন, ইয়ুং অন্য একটা জগৎ নিয়ে। দুটোর মধ্যে কোন inner contradiction নেই, আমি বলছি কোন inherent contradiction নেই। Collective unconscious মানুষের unconscious behaviour-কে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করে। আর entire class structure conscious behaviour-কে determine করে। কিন্তু unconscious, যেমন dream world, তুমি-আমি স্বপ্ন

দেখি, মার্কসবাদ দিয়ে তাকে analyse করে কি কোন লাভ হবে? সেখানে ইয়ুং, this is what I feel. ইয়ুং-এর সঙ্গে মার্কস-এর কোন বিরোধ নেই, দু'জনে দুই জগৎ নিয়ে কারবার করেছেন। দুটো প্রচণ্ড ভাবে পরিপূরক।

আমার ছবিতে ইয়ুং-এর যে-ব্যাপারটা প্রচণ্ড ভাবে আসে, সেটা হল ঐ mother complex. আমাকে আমার এক বন্ধু বলেছিল, তোকে মায়ে খেয়েছে। আমার সমস্ত ছবিতে ঐ মা এসে পড়ে— তা মায়ে খেয়েছে কেন? এই 'যুক্তি তক্কো' ছবির entire ছৌ-নাচটার raison d'ètre হচ্ছে মা— mother complex. এখানে ঐ মেয়েটাকে, শাঁওলিকে তার সঙ্গে equate করো, জ্ঞানেশ বলছে, নাচো, তোমরা নাচো, তোমরা না-নাচলে কিছু হবে না। এটা সম্পূর্ণ Jungian, 'তিতাস'-এ ছেলেটি স্বপ্ন দেখে মা-কে ভগবতী রূপে, এই mother complex একটা basic point.

এর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

সাধারণ দর্শকমানসে যদি এর ফলে কোন মোহ সৃষ্টি হয় তো আমি নাচার, আমার বলার কিছু নেই। আমার দিক থেকে এ ব্যাপারে ধর্মের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। Primordial force হচ্ছে ভগবান, you cannot deny it, basic primordial force হচ্ছে mother complex— মা—

নারীরা আমার মতে সমাজের এবং সংসারের আদ্যাশক্তি। সে জন্যে আমার ছবিতে সর্বদাই নারীর প্রতি মমতা, স্নেহ এবং শ্রদ্ধার প্রকাশ রাখার চেষ্টা করেছি।

অতীতকে লঙ্ঘন করে, তাকে বিস্মৃত হয়ে আগে যাওয়া যায় না। আমার অতীত আমারই, আমি বিশ্বের এই ভূখণ্ডে জন্মেছিলাম। আমার অতীত আমার কাছে গৌরবের বিষয়। আমি অতীতের জমিতে পা না-রেখে সেই দূর আকাশ ছুঁতে চাই না যেখানে আমার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। আমি আমার নিজের অতীতের সঙ্গেই মানবসভ্যতার মুখ্য ধারার দিকে যেতে পারি।

আমি কেবল স্বকীয় বিষয়ের খোঁজ করছি। সেটা যদি সঠিক হয় তবে সে নিজেই নিজের স্বরূপ গড়ে নেবে। এটা আবহমান কাল হয়ে আসছে এবং চিরকালই তা-ই হবে। যদি স্বকীয় রূপের প্রতি সচেতন থাকা যায়, তবে সে-ই আগে ধরা দেবে।

শিল্পকে সরিয়ে দিয়ে বক্তব্য বা বিষয় দাঁড়ায় না। কিন্তু যদি এমন কিছু ভাবা হয় যে শিল্পীরীতিকে ভেঙে এমন কিছু একটা করব, যাতে শিল্পের

style মাহাত্ম্য পাবে, তবে তা দেখার একটা ভুল পন্থা। শিল্পকল্পনার মধ্যেই তার রূপ নিহিত আছে, ওটাই প্রাথমিক আধার। শিল্প ব্যাপারটাই যদি প্রধান হয় তবে শিল্পের শুদ্ধতা তা নষ্ট করে। নির্মিতির অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বই হল বক্তব্য। বক্তব্যবাহী সঠিক শিল্প হলে তা সঠিক ভাবেই প্রকাশ পাবে, প্রতিচ্ছবির সতত স্ফুরণ ঘটবে, ধ্বনির স্পন্দন অনুভূত হবে। এ রকম ভাবার কোন প্রয়োজন নেই যে এ বার নতুন কিছু করি। ঐ ব্যাটা মানুষের ওপর লাল রঙ চাপিয়েছে তো আমি নীল রঙ চাপাই। আমার প্রয়োজন হলে রঙ ব্যবহার করব, যদি নীল রঙের প্রয়োজন হয় তো নীল-ই লাগাব।

যে-সব পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রতীক-ইঙ্গিত আমি আমার ছবিতে দিয়ে এসেছি সে সমস্তই প্রাথমিক ভাবে মূল্যবান আস্থারই প্রতীক ছিল। পরে জনসাধারণের ধ্যানধারণা অনেকটা কলুষিত হয়েছে। আমার মনে হয়নি যে চরিত্রগুলি পুরাতনপন্থী বা তারা সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা পোষণ করে। আমি কেবল এই অনুভব করেছি যে মানবসভ্যতা দুধের মতোই মায়ের শোণিত পান করেই অগ্রসর হয়। মায়ের প্রতিচ্ছবি আমার কাছে এতটা মহত্ত্বপূর্ণ বলেই মা সম্পর্কে পৌরাণিক চিন্তাচেতনার প্রতি আমার ভাবনা বার-বার আকৃষ্ট হয়েছে। আপনি হয়তো বলতে পারেন যে আমি মাতৃগ্রন্থি দ্বারা পীড়িত। আমার এক বন্ধু তো একবার বলেই বসলেন যে এই মা-ই তোমাকে খাবে। এই মাতৃপ্রতীক ব্যাপারটাকে কোন যুগ-বিশেষের সমাজব্যবস্থা বা রাজতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে ভাবা খুব ভুল হবে। যাবতীয় সৃষ্টির মূলে মা হল এক শাশ্বত শক্তি। সে কখনও বুড়ি হয় না। আমার প্রতিটি পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রই কোন-না-কোন ভাবে বিদ্রোহী।

কিছু-কিছু লোক আছেন যাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এ সব কাজে লাগান। তাঁদের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি মা-কে ব্যবহার করি কাব্যিক দ্যোতনায়, কোন ধর্মীয় অর্থে নয়। আমার মূল বক্তব্য হল নিজের ভবিষ্যৎকে দেখো, আর তাই এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত শিশুর প্রতীকই দেখা দেয়। তার তাৎপর্য এই যে এই ঘোর পাপ আর পতনের মধ্যেও, যা আমি দেখিয়েছি, উত্তরণের মধ্যে দিয়েই মানুষ আগামীর দিকে এগোবে এবং একদিন-না-একদিন সংসারকে সুখময় করে তুলবে। তুমি যদি আন্তন চেখভ-এর 'Cherry Orchard' গল্পটা পড়ে থাকো, তা হলে হয়তো মনে পড়বে যে সেখানে একটি চরিত্র আর-এক জনকে জিজ্ঞেস করছে, 'কার জন্য তুমি চারাগাছটার এত যত্ন করছে? এ তো আর তোমার কোন কাজে আসবে না।' লোকটি তাতে উত্তর দেয়, 'আমি ঠিক জানি না, হয়তো দু'শো

বছর বা দু'হাজার বছর বাদে এ দিয়েই সংসার সুখময় হয়ে উঠবে। আজ আমি সেই সুখী সংসারের জন্যই কাজ করছি। যতটুকু কাজে লাগতে পারি ততটুকুই করছি।' চেখভ-এর মতো আমিও ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা রাখি। আমার শিল্প মানুষকে হতাশ করবে না। রবীন্দ্রনাথের সেই বার্তা আমি কখনও ভুলতে পারি না যে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।

শৈশবে সংগ্রহ করার মতো বস্তু হল. . . তীব্র জিজ্ঞাসা, যা প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই থাকে। শিশুর কাছে সব কিছুই নতুন, তাই তার প্রতিক্রিয়াও খুব তীব্র হয়। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে জীবনের জটিলতা মানুষকে এমন সংকটের মধ্যে ফেলে যে তার চেতনার ঐ অংশ ক্রমশ ক্ষীণ হতে থাকে। প্রত্যেক শিল্পীরই এই শিশুসুলভ কৌতূহল ধরে রাখা উচিত। মাক্স রেনহার্ট বলেছেন যে শিল্পীকে তাঁর শৈশবের একটা অংশ নিজের পকেটে পুরে রাখতে হবে। চ্যাপলিন যেটা প্রচুর পরিমাণে সুরক্ষিত রেখেছিলেন। আইন-স্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্বের পিছনেও এই ব্যাপারটা সক্রিয় ছিল।

(আমার ছবিতে) মহাকাব্যিক চেতনা ব্যাপারটা বিদগ্ধ মননশীল ব্যক্তিদের দেওয়া বড়-বড় অভিধা মাত্র। আমি সচেতন ভাবে এর জন্য কোন চেষ্টা করি না। আমাদের দেশের গাঁ-গঞ্জের মানুষের কাছে আমাদের মহাকাব্যের প্রতিটি প্রসঙ্গ, প্রতিটি তত্ত্ব, প্রত্যেক বক্তব্য গভীর ভাবে পরিচিত। এ সব তাদের রক্তে মিশে আছে। তারা এ সবের আর অধিক কোন প্রাঞ্জলতার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালি ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়াজেদ আলি-র এক চরিত্র সন্ধ্যায় ল্যাম্পের আলোয় রামায়ণ পড়তে-পড়তে ছেলেকে বলে, সেই tradition সমানে চলেছে। আমার কাছে এই মহাকাব্য হীরের খনির তুল্য, যা আফ্রিকার আসল হীরের খনির চেয়ে মোটেই কম মূল্যবান নয়, তা হলে এর প্রয়োগ ঘটাতে আপত্তি কোথায়? আপনাদের মতো শহুরে লোকেরা শত-শত বছরেও এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারেন না।

আমার ছবিতে (সাধু বা ফকিররা) থাকেন এই কারণেই যে লোকজীবনের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। এই একই কারণে আমার ছবিতে আমি লোকগীতি ব্যবহার করি যাতে দর্শক এ দেশের তিন হাজার বা তিনশো বছর আগেকার মানুষেরও ব্যথা কী ছিল, তা জানার সুযোগ পান আর বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তার তুলনা করতে পারেন। আমাদের সমাজে নারীর স্থান আর কতটুকু? সবচেয়ে শোষিত শ্রেণী তো এঁরাই। আমি এঁদের মনোভাব প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি যথাসাধ্য। বাংলার 'উমাগীতি' আর 'গৌরীগীতি'

মেয়েদের চিরবেদনার কথা ব্যক্ত করে। বাংলা লোকগীতির আর-এক প্রকাশ বিরহিণীর মনোব্যথায়। 'তিতাস'-এ আমি এই বিরহিণীর গান ব্যবহার করেছি। যুগ-যুগ ধরে বাংলার লোককবিরা রাধা আর কৃষ্ণকে সম্বোধন করে আপন ব্যথা আর আপন জীবনের অভিশাপের কথাকে ব্যক্ত করে আসছেন।

একটি ছবিতে সঙ্গীতের ভূমিকা ততখানি গুরুত্বপূর্ণ, যতখানি ক্যামেরা-র। সঙ্গীত সিনেমার এক অপরিহার্য অঙ্গ।

'সুবর্ণরেখা'য় যে-অবাঙালি গানগুলি আমি ব্যবহার করেছি, তার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে প্রাচীন ধ্রুপদ। এগুলি সাধারণত আজকাল আর ব্যবহৃত হয় না। কলাবতী রাগে গাওয়া 'আজু কি আনন্দ' গানটি অবনীন্দ্রনাথের 'রাজকাহিনী' থেকে নেওয়া। এগুলি সম্পর্কে আমার কিছু ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছিল। তা-ই ব্যবহার করেছি। এ ছাড়া, রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও ব্যবহার এখানে আমি করেছি। সঙ্গীত সম্পর্কে আমার কতকগুলি বিশেষ ঝোঁক আছে, এ ছবিতে সেই ঝোঁকগুলি প্রকাশ পেয়েছে।

সঙ্গীতের প্রয়োগে আমাকে প্রথম যে-ছবি move করেছে : শান্তারাম-এর 'শকুন্তলা'। তার পরে 'কাদম্বরী'। বাংলা ছবিতে আমাকে যথেষ্ট আচ্ছন্ন করেছে দেবকীবাবুর কয়েকটি ছবি। 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গীত খুব ভালো লেগেছিল। কিন্তু তার theme music-টা (রবিশঙ্কর) Swan's River (নামে) একটি American Negro folk song থেকে তুলে নিয়েছিলেন। Otherwise ভদ্রলোকের কাজকর্ম 'পথের পাঁচালী'তে খুবই ভালো হয়েছিল।

আমি বিশেষ ছবি দেখি না, বেশি বাংলা এবং হিন্দি। কাজেই আমি জানি না এখন কী সব হচ্ছে-টচ্ছে। আমার নিজের ছবি সম্পর্কে বলতে যাওয়া ধৃষ্টতা।

আমার ছবির মধ্যে আমাকে সবচেয়ে আনন্দ দান করেছে—সঙ্গীতের দিক থেকে— সেটা হল 'কোমল গান্ধার'। ওতে বাংলার, মানে দুই বাংলার লোকসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং ইয়োরোপের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ব্যবহার করেছিলেন আমার সঙ্গীত-পরিচালক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। এবং সেটা অত্যন্ত মরমি ভাবে। ও-ছবি চোখ বুজেও আমি দেখতে পারি। এত ভালো সঙ্গীত তিনি করেছিলেন।

('সুবর্ণরেখা'তে রাগ কলাবতী ব্যবহার করা) হচ্ছে এক জনের ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার। ধরুন, বুনুয়েল-এর বিখ্যাত 'Nazarine'. ছবিটা কঠিন রকমের

বাস্তব। সমস্ত ছবির শেষ এক মিনিট ছাড়া কোথাও কোন music নেই। এবং সেই শেষ এক মিনিটও কেবল drum beating. অসাধারণ effect. ব্যাপারটা হল, আমরা কী বলতে চাই। কেউ বলে ছবি এঁকে, কেউ গান গেয়ে, কেউ বা অন্য ভাবে। বোমা ছুঁড়ব, না কামান— সেটা সম্পূর্ণ পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার। বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আপনার আছে।. . . এ ক্ষেত্রে শিল্প হচ্ছে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। আমার তো মনে হয় না রাগ কলাবতী ব্যবহার করে ছবির মেজাজের কোন ক্ষতি হয়েছে।

শুধু 'সুবর্ণরেখা'য় কলাবতীর কথা কেন? পৃথিবীর বহু অসাধারণ ছবি, যেমন ফেলিনি-র 'La Dolce Vita'-তে 'পেট্রিসিয়া' নামক এক বিশেষ মেজাজের music ব্যবহার করা হয়েছে। সার্থক হয়েছে কি না, সে তো বিচার করবেন আপনারা।

(বর্তমান বাংলা ছবির মধ্যে) উল্লেখযোগ্য কি না বলতে পারছি না, তবে আমার কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ মনে হচ্ছে একটি বিষয়— এই ধরুন না, বর্তমানে চিত্র-পরিচালকদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে music director হবার। ভাবতে অবাক লাগে কী করে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। চিত্রনাট্য পরিচালনা সম্পাদনা— এই তিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রতি পরিচালককে সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখতেই হয়। এর ওপরে সঙ্গীতের অতিরিক্ত দায়িত্বকেও নিজের বলে গ্রহণ করা উচিত কি না সে প্রশ্নের উত্তর খুব অল্প দিনের ভেতরেই পাওয়া যাবে।

চলচ্চিত্রে সঙ্গীতের একটা নিজস্ব ভঙ্গি আছে, সাধারণ পায়ে-চলার পথে তার আনাগোনা নয়। চলচ্চিত্রে সঙ্গীত নিয়ে আমাদের দেশে গভীর ভাবে অনুধাবন মোটেই হয়নি, বা অনুধাবন করার মতো সুযোগ, প্রবৃত্তি বা দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন লোকের আগমন ঘটেনি। প্রায় সমস্ত সঙ্গীত-পরিচালকই শস্তায় কিস্তিমাতের পক্ষপাতী। চলচ্চিত্র-সঙ্গীতের যে একটা নিজস্ব দাবি আছে, তা-ই নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি বা ঘামাতে রাজি নন। এর ফলে সার্থকনামা সঙ্গীত-পরিচালকের সৃষ্টি আজও সম্ভব হয়নি। চিত্র-পরিচালকের ওপরেই সঙ্গীতের ব্যবহার নির্ভর করে। তাই যখন উপযুক্ত সঙ্গীত-পরিচালকের অভাব দেখা দিল, অতিরিক্ত বাহাদুরি পাবার লোভ সামলানো পরিচালকদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না।

চিত্রসঙ্গীতের নামে তাঁরা যা করেন সেটা কহতব্যও নয়, প্রকাশিতব্যও নয়। চিত্রসঙ্গীতের দাবিকে মেটানো বর্তমানের অনেক পরিচালকের পক্ষেই সম্ভব নয়। অবিশ্যি এটা আমার ব্যক্তিগত মত। এই বিষয়ে অনেকেই বিরুদ্ধ

মতও পোষণ করতে পারেন। তবে আমার মনে হয় এটা এক ধরনের বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

(যদি কেউ প্রমাণ দাবি করেন তো) সেই challenge-এর উপযুক্ত উত্তর দেবার মতো মালমশলা আমার মজুত আছে বৈ কী। থাকগে সে সব কথা। আসল কথাটা হচ্ছে এই, চিত্রসঙ্গীত সম্পর্কে খাটাখাটুনি পরীক্ষানিরীক্ষা করা একান্তই প্রয়োজনীয়। সেটা একেবারেই হয়নি বা এখনও হচ্ছে না। যে-দিন সেটা আন্তরিকতা নিয়ে আরম্ভ হবে সে দিনই জানবেন বাংলা ছবির বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকের মোহমুক্তি ঘটেছে।

(Folk music-এর class division নিয়ে) চিন-এ কী আলোচনা চলছে আমি জানি না। কিন্তু আমার নিজের একটা ধারণা আছে। সেই Primitive Communism-এর পরের যুগ থেকে সব যুগই class-divided. সেই Primitive Communism-এর period-এর বিশেষ কোন শিল্পকর্ম সম্পর্কে, এক ঐ স্পেনের আলতামিরা বা কাইমুর রেঞ্জের গুহাচিত্র ছাড়া আমরা বিশেষ কিছু জানি না। কাজেই যা হয়েছে, যা জানি, তা সবই ঐ class art, আমি তার প্রত্যেকটার অংশীদার। প্রশ্ন হল, আমি কী ভাবে সেটাকে apply করব, basic point application. যে-ভাষায় আমি কথা বলছি (তা) পাণিনির ব্যাকরণ থেকে derivation, অপভ্রংশ, অপভ্রংশ থেকে অর্ধবহ, অর্ধবহ থেকে বাংলা— এ সবই শ্রেণীর সৃষ্টি, class-কে বাদ দিয়ে আমি যাব কোথায়? Proper communism আসেনি কোথাও, সে সোভিয়েত ইউনিয়নেই বলো আর চিনেই বলো। All art work is class work, সমস্ত কিছুই class based, classical music নিশ্চয়ই class music. এখন আমি আমার চিন্তাভাবনা ইত্যাদি দিয়ে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সে সমস্তকেই ব্যবহার করব, ব্যবহার করব আমার প্রয়োজনে।

(উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের) (সে) ব্যক্তিটি ছিল পাগল। আমার গুরু, তাঁর কাছে নাড়া বাঁধা, তাঁর কাছে আমি সরোদ শিখেছি। বেশ কয়েক বছর আগে তিনি মাইহারে কাজ করতেন। অর্থাৎ মাইহারের মহারাজার দরবারি বাদক ছিলেন। আমি একটা documentary ছবি, আমাদের সঙ্গীত-নাটক আকাদমির হয়ে করতে যাই। সে সব ব্যাপারে অনেক জিনিশ শুনেছি। সেগুলো স্মৃতিচারণা হিশেবে বলা যেতে পারে। উনি ছোটবেলায় আট বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালান। ওঁর দাদা ছিলেন আফতাবউদ্দিন সাহেব। অসম্ভব ভালো বাঁশি বাজাতেন। এবং ছিলেন বাউল এবং কালীভক্ত, একসঙ্গে। তাঁর কাছ থেকে

শিক্ষা। তা, এ আলাউদ্দিন সাহেব আমাকে যেগুলো বলেছেন আর কী! তিনি আমাকে খুব ভালোবাসতেন। ছোটবেলায় মক্তবে পড়তে যেতেন। পথে একটা কালীবাড়ি পড়ে। তো, উনি গিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ পুরোহিতগুলো মুসলমান বলে ঢুকতে দিত না, মারত। আর আফতাবউদ্দিন সাহেব পায়ে দড়ি বেঁধে গোয়ালঘরে, ওদের বাড়ি ব্রাহ্মণ-বেড়িয়া, গ্রাম্য দেশ তো— খুঁটোর সঙ্গে বেঁধে রাখত (তাকে)। সেই ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছেন। এসে, নিমতলা ঘাটে শুয়ে থাকতেন। আট বছর বয়স। সেই সময় একটা সুযোগ পেয়ে যান স্টার থিয়েটারে— তখন এই সমস্ত বেশ্যারা অভিনয় করত আর নাচত। নাচ-ফাচের ব্যাপার-ট্যাপার ছিল। সেইখানে বাঁশি বাজানোর কাজ পাঁচ টাকায়। মাসকাবারে পাঁচ টাকা মাইনে। এই বাঁশি বাজানোর কাজ দিয়ে আরম্ভ করলেন। তারপরে উনি চলে গেলেন উদয়পুরে। উদয়পুরে গিয়ে, সেখানে তখন সবচেয়ে বড় ওস্তাদ ছিলেন যে উজির খান, সরোদের, তাঁর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছেন। করে শিখতে হবে। উজির খান তাঁকে পাত্তাই দেন না। তখনকার যুগের ব্যাপারটা তো অন্য রকম ছিল, আজকে থেকে প্রায় একশো বছর আগের কথা বলছি। পাত্তাই দেন না। শেষে তিনি করলেন কী— যে, রোজ দরবারে উজির খান যান আর ফেরেন ঘোড়ায় চড়ে— উনি রাস্তায় শুয়ে পড়লেন। যে, আমি আপনাকে যেতে দেব না, আমাকে কাজ শেখাতেই হবে। সঙ্গীত আমাকে দিতেই হবে। তখন সঙ্গীত ছিল একটা secret. কেউ কাউকে দিত না। সে সব যুগগুলো আপনারা কতখানি দেখেছেন আমি জানি না, আমার খানিকটা দেখা আছে, সামান্য। (উজির খান বললেন) তবে ঠিক হ্যায়, তুই আমার বাড়িতে চাকর হয়ে থাক। আলাউদ্দিন খাঁ বাসন মাজেন, রান্না করেন আর জুতো খান। আর উজির খান যখন রেওয়াজ করেন, সেইটে শোনেন। হাতে যন্তরটি দিতেন না। দুটি বছর এই করার পরে উজির খাঁ বললেন, হ্যাঁ, তুই আমার শিষ্য হবার উপযুক্ত— মোটামুটি এই কথাই আর কী হিন্দিতে, মানে উর্দুতে। একই কথা। তখন শেখার ব্যাপার। চোদ্দ বছর শিখলেন। উজির খাঁ তারপরে. . .। কোন ওস্তাদ. . . আমাদের ওস্তাদরা. . . যেমন আমাকে হুকুম দিয়ে যাননি যে বাইরে বাজাও। ওস্তাদরা time হলে তখন বলেন যে, এখন বাইরে যা, বাজা। তৎপূর্বে কোথাও বাজাবি না। মানে, you are not allowed. যেমন I am not allowed. উনি মারা গেছেন, আমাকে হুকুম দেননি, কাজেই আমি বাজাই না। আমি বাজাই আমার বৌ-বাচ্চার কাছে। আর কোথাও না। সেই সরোদও আমি ছেড়ে দিয়েছি, দিয়ে দিয়েছি অন্য জায়গায়। যাকগে। (উজির খান) ঐ যখন হুকুম দিলেন চোদ্দ বছর পরে যে

তুই বাজাতে পারিস বাইরে এখন, তখন উনি আবার ব্রাহ্মণবেড়িয়া ফিরে গেছেন। এবং সেখানে গিয়ে— একটা মহজিদ, মানে মসজিদ যাকে বলে আমাদের ভাষায়— ঐ তো পাশে, তিতাসের ধারে— ওর পাশে বাচ্চারা খেলা করছে একটা বল নিয়ে— করতে-করতে বল ঐ মহজিদের কার্নিশের ওপর পড়ে গেল। বাচ্চাদের খেলা বন্ধ। তো আলাউদ্দিন খান সাব বললেন যে, আচ্ছা, আমি ওটা নাবিয়ে দিচ্ছি। বলে নাবাতে গেলেন, ওটা গেল ভেঙে। পড়লেন এবং হাতটি পুরো ভাঙল। সে ভাঙা হাত, ওখানে কোন cure করার রাস্তা নেই। তখন এলেন কলকাতায়। ওঁকে পাঠানো হল মেডিকেল কলেজে, তারা বলে এ হাত কখনও সারবে না, এ একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। উনি তখন এই মাইহারের মহারাজার State musician. সেইখানে ফিরে গিয়ে— ওখানে প্রচণ্ড নাম-করা মন্দির আছে পাহাড়ের ওপরে, সেখানে গিয়ে না-খেয়ে শুয়ে থাকলেন— যে, মা আমার হাত ঠিক করে দে। মানে, চামুণ্ডা আর কী! কালী। সেইখানে শুয়ে হাত কী করে সেরে গেল, উনি নিজেই জানেন না। মানে, উনি নিজে বলেন, মানে বলতেন। আমাকে এগুলো সমস্ত বলেছেন, details of his life. কিন্তু হাতটা তো জখম হয়ে রইল। ডান হাতে বাজাতে হবে সরোদ, (কেননা) এত দিন শিখেছেন ডান হাতে। কিন্তু ডান হাত আর কাজ করছে না। আবার শিখতে আরম্ভ করলেন বাঁ হাতে। সম্পূর্ণ change করে। মানে কতখানি মনের জোর! এবং ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ musician হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, this was আলাউদ্দিন খাঁ। আলাউদ্দিন খাঁ সম্বন্ধে বলতে গেলে তো লক্ষ-লক্ষ কথা বলতে হয়। মানে, এত বলতে হয় যে সীমা নেই। কারণ সে আমার গুরু এবং আমি. . .। হাফিজ আলি খান সাহাব আর-একজন great সরোদিয়া। বিলায়েতের কোন তুলনা নেই। বিলায়েতের mood যখন চাপে, তখন সেখানে একমাত্র আলি আকবর যখন mood-এ থাকে, তাঁর সঙ্গে বসতে পারে। রবিশঙ্কর-টবিশঙ্কররা হচ্ছে অনেক বেশি বাজাইয়া। এঁরা হচ্ছেন real musicians. এখন যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের মধ্যে— গাইয়েদের মধ্যে— গলার দিক দিয়ে বলছি, ভীমসেন যোশিকে আমার খুব ভালো লাগে।

চলচ্চিত্র এবং নাটকে অভিনেতার ভূমিকা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার ব্যবহারিক তফাত ছাড়াও দার্শনিক একটা তফাত আছে। কেন আমরা বলি যে, চলচ্চিত্রে শিশুরা সবচেয়ে ভালো অভিনেতা— কথাটা তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করবেন। শিশু কিংবা বৃদ্ধ, এবং বিশেষ করে অশিক্ষিত অভিনেতা, চলচ্চিত্রের সবচেয়ে ভালো উপাদান।

অভিনয়ের ধারা বিজ্ঞান এবং প্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে যুগে-যুগে পালটেছে এবং পালটে যাচ্ছে। আমরা আজকাল behaviourism-এর কথা বলি, কিন্তু ওটাও পুরনো হয়ে গেছে। জাভাত্তিনি এখন সেকেলে! ব্রেশট-এর 'Organon'-এর সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটায় ওলটপালট ঘটে গেছে। তারই সূত্র টেনে ধরে এনে ছবিতে জঁ লুক গোদার এবং আপনারা যাঁর কথা বেশি শুনেছেন সেই আল্যাঁ রেনে এবং আল্যাঁ রব গ্রি-এর 'Last year at Marienbad' ছবিতে এবং বিষয়বস্তু অনুসারে ছবির অভিনয় পদ্ধতি বদলাতে বাধ্য। 'Seven Samurai'-তে তোশিরো মিফুনে-কে আপনাদের মনে আছে কি? তাকে কী করে ব্যাখ্যা করবেন?

স্বল্প পরিসরে উত্তরের আকারে ছবিতে এবং নাটকে অভিনয়ের পার্থক্য সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যায় না।

আমি দু'ধরনের অভিনেতাকে চিনি। প্রথমত, শিশু-অভিনেতা। মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় ফিল্মের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা হচ্ছে শিশুরা। এরা কী করতে হবে তা খুব সহজে বোঝে। দ্বিতীয়ত, আমি চিনি শিশির ভাদুড়ির মতো অভিনেতা বা প্রভা দেবীর মতো অভিনেত্রীকে। এঁদের কাছে কী আমার প্রয়োজন, তা গুছিয়ে বলা যায়। এবং এঁরা বোঝেন। এই দুই শ্রেণীর মাঝখানের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কিছু বোঝানোর চেষ্টা বৃথা। এঁদের সিনেমা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। এঁদের খাটিয়ে নিতে হবে কলের পুতুলের মতো।

আমি সর্বদাই নিজে অভিনয় করে দেখিয়ে দিই এবং যতক্ষণ না আমার মনমতো অভিনয় আমি তাঁদের কাছ থেকে পাচ্ছি, ততক্ষণ আমি shot গ্রহণ করতে প্রস্তুত নই।

অভিনেতারা আমার কাছে robot মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। কারণ সিনেমায় composition-গুলির মধ্যে মানবজীবনের ঘটনাবলি ঘটতে থাকে, অভিনেতা তার মধ্যে আছে। কিন্তু এর তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য শিল্পের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি তাদের থাকে না।

অভিনেতাদের compositional value, frame-এ অন্যান্য বস্তুর সমান।

জনপ্রিয় অথবা নতুন মুখ, এ সব ব্যাপারে আমি কোন কালেই সংকীর্ণ মনোভাব পরিপোষণ করি না। আমি প্রয়োজনানুসারে প্রথম থেকে জনপ্রিয় শিল্পী ব্যবহার করে আসছি এবং শেষ পর্যন্ত করেও যাব। তবে নামী-দামি শিল্পী হিশেবে নয়, উপযুক্ত শিল্পী হিশেবেই।

আমি তথাকথিত কোন তত্ত্বে বিশ্বাসী নই, কারণ আমি বিশ্বাস করি— শেষ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা কতকগুলি ক্রীড়নক মাত্র। আমরা আমাদের ছবির ভাষায় shooting-এর সময় ঘরের দেওয়াল, চেয়ারটেবিল, আয়না— এগুলোকে set properties বলে থাকি, অর্থাৎ নিশ্চল নির্বাক্ সম্পত্তি এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আমার কাছে কেবল চলমান সবাক্ properties. এর অধিক সম্মান দিতে আমি প্রস্তুত নই। তবে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে এবং সময়ে তেমন প্রতিভাও আসে, যদিও তা আসে খুবই কদাচিৎ।

গত তিরিশ বছরের মধ্যে বাংলা ছবির দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বেশ কিছু রদবদল হয়েছে, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে সব পরিবর্তনই যে সব সময় ভালোর দিকে হয়েছে, তা বলা চলে না। যুগ-প্রবর্তনকারীদের ভেতর পথিকৃৎ হলেন প্রথমেশ বড়ুয়া। 'অধিকার', 'গৃহদাহ' ইত্যাদি ছবির মাধ্যমে তিনি যে শুধু বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তা-ই নয়, একটা বিরাট সম্ভাবনার পথনির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে, বিশেষ করে যুদ্ধের সময়ে সে পথচিহ্নকে অনুসরণ করার মতো পরিচালকের অভাবে সে সুযোগ প্রায় নষ্টই হয়ে গেল বলা চলে। বিমল রায় অবিশ্যি 'উদয়ের পথে', 'অঞ্জনগড়' ইত্যাদির মারফত সেই হারানো পথটা আবার খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিছুটা সার্থকও হয়েছিলেন এ কথা নিশ্চিত। এর পর থেকেই বাংলা ছবির একটানা অবনতি শুরু।

বেশ কিছু দিন এ ভাবেই কেটে গেল। ১৯৫৬ সালে অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী'র আবির্ভাব হল। শুরু হল আর-এক অধ্যায়। সত্যজিৎবাবু এবং আরও কয়েকজন আদর্শবাদী পরিচালক বাংলা চিত্রজগতে এক নতুন ধারা এবং প্রাণ সঞ্চার করবার চেষ্টা করলেন। তার ফলে কিছু-কিছু কাজ হল। পৃথিবীর বর্তমান ছবির জগতের দিকে তাকালে বা তুলনা করলে সেটা নগণ্যই বলা চলে। মিছিমিছি নাচানাচি করবার মতো কিছুই ঘটেনি। তবু তা-ই কত না চায়ের কাপে তুফান তুলল! অবিশ্যি এ কথা মানতেই হবে যে আমাদের দেশের তুলনায় এ সময়ে কিছুটা কাজকর্ম হয়েছে বৈ কী।

প্রমথেশ (বড়ুয়া) ১৯২৮ সালে বড়ুয়া Studio খুলেছিলেন। তারপর তিনি বি.এন. সরকার সাহেবের সঙ্গে মিলে নিউ থিয়েটার্স চালু করেন। এবং তার পরে একটার পর একটা ছবি করে যান। যার মধ্যে অনেকগুলো তখনকার

যুগের হিশেবে অনবদ্য। তার মধ্যে কিছু ছবি প্রচণ্ড পয়সা পায়, কিছু ছবি প্রচণ্ড মার খায়। এটা যে-কোন শিল্পীর ভাগ্যে অবধারিত। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি 'গৃহদাহ'। আমার মনে আছে 'চিত্রা' সিনেমায় তিন দিনের মাথায় দর্শকরা screen ছিঁড়ে দেয়। ওখানে অচলার transition from town to villge যে-montage-এর দ্বারা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন তখন তা অভাবনীয়। Subjective camera-র use ভারতে তিনিই প্রথম প্রচলন করেন। তাঁর 'উত্তরায়ণ' ছবি দেখলে সেটা বোঝা যাবে। এ সব ছবি আজকের লোকে মনে রাখে না। রাখে 'মুক্তি', 'দেবদাস' ইত্যাকার অত্যন্ত sentimental cheap ছবি।

এখন কিছু-কিছু ব্যক্তি তাঁকে প্রিন্স পি.সি. বড়ুয়া বলে বিদ্রূপ করার চেষ্টা করছেন। তাঁদের জানা উচিত সেই বন্ধ জানালার যুগে এই লোকটা কিছু করার চেষ্টা করেছেন। পূর্বসূরীদের অস্বীকার করে নিজের মাহাত্ম্য বাড়ানো যায় না।

বিমল রায় সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাকে পুজো করতে হয়। বিমল রায় কী রকম ছবি-করিয়ে ছিলেন, সেটা বড় কথা নয়। তিনি কী রকম মানুষ ছিলেন সেইটে আমার কাছে বড় কথা। দেখুন, বিমল রায়. . . আমার রাঙাদা, সুধীশ ঘটক তাঁকে ঢাকা থেকে নিয়ে আসেন। Third assistant হিশেবে। তখন আমরা ছাত্র, মানে জানিই না, film line সম্বন্ধে কোন ধারণাই তখন নেই। তারপরে এই বিমলদা আমাকে কোলে করে নিয়ে নিউ থিয়েটার্সে. . . তখন দরজা খোলা যেত না। দারোয়ানরা মানে এখনও তা-ই করে, তখনও তা-ই করত, যে set-এ. . . মানে ঢুকতেই দেবে না। হ্যাঁ, সেই সময়ে বিমলদার সঙ্গে আমি কাজ করেছি। I have worked. তারপরে এন.টি. ভেঙে গেল। তারপরে ভারতলক্ষ্মীতে 'তথাপি' বলে একটা ছবি, সেটা বিমলদা করলেন (তত্ত্বাবধান), আমাকে chief assistant. . . তার আগে 'বেদেনি'। তার আগে বিমলদা যখন ক্যামেরা থেকে সরে এসে প্রথম কাজ পেলেন. . . ঐ যে সব hit-ফিট করল না?— 'উদয়ের পথে'। বিমলদা কোলে করে আমাকে, মানে ভালোবাসার কোন সীমাসংখ্যা নেই। মানে, আমি বলতেই পারি না যে, মানুষটা কী ছিল! তা আপনারা তাঁকে. . . তাঁর ছবি-টবি সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু মানুষ কী ছিল সেটা আমি প্রাণ দিয়ে জানি। 'অঞ্জনগড়' তারপরে। ইত্যাকার ঘটনা। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরেছি বিমলদার, প্রাণ ভরে খেটেছি। কাজেই আমার বলার কিচ্ছু নেই। বিমলদা যে আমাদের পারিবারিক বন্ধু ছিলেন। কাজেই বিমলদাকে নিয়ে কী কথা বলব? আমি যা বলব সমস্ত biased কথা হবে। কারণ ও-লোকটা সম্পর্কে বলতে গেলে

আমাদের পারিবারিক, মানে, এক্কেবারে আমাদের নিজেদের ইতিহাসই (বলতে হবে)।

'উদয়ের পথে', আমি যদি সমালোচনা করি. . . বলছি। প্রাথমিক হচ্ছে যে তখন পর্যন্ত বাংলা ছবি যে-level-এ move করছিল, সেখান থেকে বিমলদা তাকে, মানে বাংলা ছবিকে মোটামুটি ভাবে হেঁচড়ে বের করেছেন — এক। দু'নম্বর হচ্ছে, ওর কথাবার্তা dialogue-গুলো আজকে শুনলে হাসি পাবে। এবং অত্যন্ত বাজে class-এর। সেটা জ্যোতির্ময়ই প্রভূত হাবিজাবি ভাষা ব্যবহার করে নষ্ট করেছে। বিমলদা খাটলে আরও ভালো করতে পারতেন এবং যেমন আমি বলছি, যে 'ছোট্ট একটা ছুঁচের দ্বারা. . .'। ('দারিদ্র্যের মতো দৈত্যের সঙ্গে. . .') এই ধরনের কথা, একেবারে rubbish! absoluteluy rubbish! এটা জ্যোতির্ময় rascal কেটেকুটে করে দিয়েছিল। . . . মিঞা, এরা সবাই আমার বন্ধু। এরা সত্যিকারের বঞ্চিত লোক।

(বাংলা ছবির) দর্শকদের ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই একটা পরিবর্তন এসেছে, ভালো ছবি সম্পর্কে আগ্রহ অনেক বেড়েছে, বিশেষ করে কমবয়সী ছেলেদের মধ্যে ভালো ছবির জন্য একটা অদ্ভুত টান এসেছে। এটা আমার কাছে যে কী আনন্দের ব্যাপার! এ প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত একটা কথা বলছি। ১৫ অগস্ট লাইট হাউসে আমার 'সুবর্ণরেখা' ছবিটি দেখানো হয়, আমি শুনেছি সেখানে এক টাকার টিকিট নাকি সাত টাকায় black-এ বিক্রি হয়েছে, এবং বেশির ভাগই young audience, তারা ছবি দেখেছে এবং তাদের ভালো লেগেছে, তারা অনেকেই এখানে এসেছে দলে-দলে, এমন বহু ছেলে, যাদের আমি চিনি না, তারা শুধু আমায় দেখতে এসেছে।

দর্শক এখন মোটামুটি তৈরি। এর পেছনে দু'তিন জন পরিচালকের contribution অবশ্যই আছে, দু'তিন জন বলব কেন— দু'জন, মৃণাল সেন আর সত্যজিৎ রায়, তাঁরা বাংলা ছবির অনেকখানিই ওলটপালট করে দিয়েছেন, আশা রাখি, ভবিষ্যতেও দেবেন।

ছবি আমি কম দেখি। সত্যজিৎবাবুর বা মৃণাল সেনের ছবিই আমি কম দেখেছি, বাকিদের ছবি আমি দেখি না। আমার স্ত্রী বা অন্য কেউ দেখে আসে, এসে গল্প-টল্প করে, আমি বলি ঠিক আছে, ঠিক আছে। কী হবে ও-সব দেখে? তোমরা ছবি দেখবে, ভালো লাগলে ভালো, আনন্দ হলে আনন্দ, খারাপ লাগলে খারাপ, বেরিয়ে বলবে, দুর! আমি ছবি দেখতে ঢুকে ইস্কুলের ছাত্র হয়ে যাই, এই shot-এর পর এই shot-এ কাটল কেন? এখানে কাটল কেন, এটা কী করল, ওটা কী করল, continuously brain work করতে

থাকি। যদি সম্পূর্ণ ভাবে আকর্ষণ না-করতে পারে যা একদিন 'পথের পাঁচালী' করেছিল, তা হলে শুধু grammar-এর দিকে চলে যাই, ফলে কোন আনন্দ পাই না।

(বাংলা ছবির বর্তমান নিয়ে) আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া খুব সোজা ভাবে সম্ভবপর নয়। কারণ বাংলা ছবির আমি যেটুকু জানি বা আমার যেটুকু জ্ঞান, তার থেকে বলছি যে ছোট-ছোট ছেলেরা আছে, যারা কাজ করতে চায় seriously. কিন্তু তাদেরকে কেউ কাজ দেবে না, কারণ তাদের কেউ মাইনে দেবে না। আর আমাদের line-টা এমন, এখানে লাখ-লাখ টাকা না-থাকলে কোন কাজ করা যায় না। আমরা পারি— নানা রকম বাঁদরামি করে, বদ-মাইশি করে, দুষ্টুমি করে। Somehow or other we manage. কিন্তু these kids— এদের কম্ম না। বুঝতে পেরেছেন! এদের মধ্যে থেকে কে বেরবে, কে বেরবে না, আমি জানি না। কিন্তু আমার প্রচণ্ড ভরসা আছে। কারণ আমি ভয়ঙ্কর ভাবে ভবিষ্যতে বিশ্বাস করি। আমার এই ছেলেপুলেগুলোর মধ্যে থেকে কেউ-না-কেউ আমার থেকেও বড় হবে— আমি ভীষণ ভাবে এটা বিশ্বাস করি। কিন্তু এদেরকে তো কেউ কাজ দিচ্ছে না! এরা খেতে পাচ্ছে না, এরা না-খেয়ে ঘুরছে। স্টুডিওপাড়ায় আপনি আমার সঙ্গে চলুন, দেখবেন যে এই সব বাচ্চাগুলো কী অভাবগ্রস্ত। যে, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খাবার পয়সা পর্যন্ত নেই। এরা ছবি করবে কী করে, আমি জানি না। তবে করতে যদি পারে, এদের মধ্যে থেকে কেউ-না-কেউ, সব ক'টাই নয়— টেনে বেরিয়ে যাবে মশায় এবং আমাদেরকে হারিয়ে দেবে। আমি, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, এ সব, সব হেরে যাব। এবং হারতে চাই আমি। এরা করুক, এই বাচ্চারা করুক।

(বাংলা ছবিতে নতুন কেউ) হচ্ছে না, কারণ তাদেরকে আপনারা চেনেন না। আমি জানি India lab-এ ঘুরে বেড়ায় অন্তত আট-দশটি ছেলে, যারা কাজ পায় না। তাদের মধ্যে অন্তত দু'তিন জন brilliant script নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোথায় করতে হবে কী ভাবে করতে হবে— এক। দু'নম্বর হচ্ছে যে, সাহস নেই। আশাবাদী কোন্ দিক থেকে আমি? আমরা যে দু'তিন জন— আমরা যদি সাহস আনতে পারি। লড়াই করতে হয়, কিন্তু শেষ অবধি যদি জেতা যায় এবং সত্যি-সত্যি ভালো ছবি হয়— পয়সাও পাওয়া যায়। ওদের আসল কথা, আমার প্রথম ছবি, জীবনের সেই ছবির জন্যে ভয়।

ভয়টা ভাঙবে কে? Leader? আরে মশায়, ভয় আপনি করছেন না? করুন না ছবি! এ সব পত্রিকা-টত্রিকা করছেন কেন? ভয়। ও-সব থাকে। career-এর প্রথম ছবি করব, তারপর এমন মার খাব যে শালা পথের ভিখিরি হয়ে মুখে ফেনা উঠে রাস্তায় পাগল হয়ে মারা যাব— বৌ-বাচ্চা নিয়ে TB হয়ে— এ তো কেউ চায় না। এইখানে FFC বা Film Development যদি বুদ্ধিমানের মতো সৎ ভাবে ভালোবেসে— যেটা FFC করছে, এটা কলকাতায় যদি করে— কেন হবে না? আশাবাদী না তো কী আমি? আমি তো আশাবাদী। কথা হচ্ছে সততা থাকা চাই, যারা দিচ্ছে তাদের ভেতর। পঁচিশ লাখ টাকা বলে খালাস হলে তো হবে না।

(Talent) আছে। ব্যাপার হচ্ছে, leadership-এর অভাব।

অন্যান্য চলচ্চিত্রকারদের সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না, কিন্তু আমি নিশ্চিত ভাবেই অনুভব করেছিলাম যে আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্রের একটা বিশিষ্ট চরিত্র গড়ে ওঠা উচিত। আমি এমন এক ভাষার সন্ধানে ছিলাম যা আমার দেশের মানুষের দুঃখ, আনন্দ আর পতনের অন্তরঙ্গ স্বরূপকে তুলে ধরতে পারে। একই সময়ে আমি চাইছিলাম যে এমন এক শিল্পরীতি আমার করায়ত্ত হোক, যা যথাসম্ভব জাতীয় হয়েও আন্তর্জাতিক সার্ব-ভৌমত্বে উজ্জ্বল। এ ব্যাপারে কতটা সফল হয়েছি আমি, তার মূল্যায়ন আপনারাই করতে পারেন। আমি সারা জীবন এই অনুসন্ধানই কেবল করেছি যে কী ভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের পরম্পরা ও মৌল প্রত্যয়টিকে অনুধাবন করা যায়, যাতে সিনেমা আমাদের দেশের প্রতিচ্ছবি, দেশের স্পন্দন ও পরিচিত উপকরণকেও সর্বজনগ্রাহী করে প্রকাশ করতে পারে। এই প্রয়াসের কিছু নিদর্শন আপনারা আমার সব ছবিতেই লক্ষ করবেন। বিশ্বের মহান চলচ্চিত্রকারদের কাছ থেকে আমাদের শেখা উচিত, কিন্তু তাদের অনুকরণ করা উচিত নয়। প্রভাব কাটিয়ে ওঠাটাই সবচেয়ে জরুরি এবং সব কিছুর সমন্বিত সারবস্তুকে স্বীকার করাটাও বিশেষ প্রয়োজন। বলতে পারি না, এ ব্যাপারে আমি কতটা পেরেছি আর কী পারিনি। একদা আমি জাতীয় চলচ্চিত্রের স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য একটা আন্দোলন করতে চেয়েছিলাম।

(বর্তমান বাংলা ছবির পরিচালক?) মতলব সুবিধের নয় মনে হচ্ছে! নিন লিখুন : কারও নামই আমি করতে চাই না। কারণ, ছবির ব্যাপারে কারও ওপরই আমার কোন শ্রদ্ধা নেই। এঁদের মধ্যে দু'এক জনের যেটুকু সম্ভাবনা

ছিল, তাঁরা নামতে-নামতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছেছেন যে তার সীমা নেই। এঁরা প্রত্যেকেই আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। কিন্তু তাঁদের শিল্পকর্মের প্রতি আমার শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। অবশ্য এটা শিল্পী হিশেবে আমি বলছি না, শিল্পদ্রষ্টা হিশেবে বলার চেষ্টা করছি। আশা করি, আমার এ স্পষ্ট কথা এবং তীব্র মতবাদ তাঁরা খারাপ ভাবে নেবেন না।

ভালো ছবি এ দেশে হয় না, তার কারণ এ দেশের চিত্র-প্রযোজক থেকে শুরু করে প্রদর্শকরা, এই সমস্ত ধরনের ছবি দেখাবার উৎসাহ পান না। যে-চিন্তাটা সম্পূর্ণ ভুল। এ দেশে ভালো ছবি তৈরি করে এই সব পয়সাঅলারা কখনও দেখেননি, দেখলে দেখতেন যে ঘটনাটি সম্পূর্ণ আলাদা। আমার দেশের মানুষ ভালো কাজকে এখনও ভালোবাসে। সেটা বোঝার মতো বুদ্ধি বা ক্ষমতা এই লোকগুলির আদৌ নেই। তাই এঁরা ভালো ছবি থেকে poles apart-এ সরে থাকেন।

আর জনপ্রিয় ছবি জিনিশটা যে কী, তা পৃথিবীর কোন শিল্পীই বলতে পারেন কি? তা যদি বলতে পারতেন, তা হলে প্রত্যেকটি ছবিই প্রচণ্ড popular হত। কিন্তু ঘটনাটা তা নয়। সবারই ইচ্ছে, কিছু পয়সা হাতিয়ে নেওয়া। কিন্তু তাঁদের ভগবান জানেন, কেন সেটা হাতানো যায় না। সিসিল বি.ডি. মেলি সাধারণত গৃহীত হয়ে থাকেন ভীষণ নাম-করা অর্থকরী শিল্পী হিশেবে। কিন্তু তাঁর 'Ten Commandments' এক কোটি ডলার খরচ করেও fail করল কেন? চ্যাপলিন 'Modern Times' অত্যন্ত চিন্তা করে করেছিলেন। কিন্তু মোটামুটি পয়সার দিক থেকে তিনি ধেড়িয়েছেন। আইজেনস্টাইন 'Alexander Nevsky' করে ভেবেছিলেন খুব পয়সা কামানো যাবে। ছবিটি একদম চলেনি। আন্দ্রেই তারকোভস্কি 'Ivan's Childhood' করে ভেবে-ছিলেন ব্যাপারটা জমাতে পারবেন। সম্পূর্ণ ধেড়িয়েছেন। মিজোগুচি তাঁর ছবি ভেবেছিলেন দারুণ চলবে। চলেনি। এ রকম উদাহরণ আরও হাজারটা দিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর ছবি জনপ্রিয় হবে কি হবে না, এ কথা মানুষ তো ছাড়, স্বয়ং ঈশ্বরই জানেন না।

আমাদের industry-টা ছিল একটা চৌবাচ্চা, তার তলে ছ্যাঁদা। যত টাকাই ঢালুন, তলার ছ্যাঁদা দিয়ে সব বেরিয়ে যায়। সুইজারল্যান্ডে ছেলের জন্যে বাড়ি করবে— বাবু— হলের মালিক, ফিল্মে টাকা দেব, ওরে বাবা, মরে যাব না? তো, এই যদি attitude হয়, তারা যদি কব্জা করে সব রক্তটা চুষে নেয়, ফিল্মের glamour-এ যত রাজ্যের মেয়েছেলের গায়ে গা ঘষব, এই তাল করে

মাড়োয়ারি আসে, এসে heavy টাকা গচ্চা দিয়ে পালায়— এই করে একটা ভালো industry, একটা ভদ্র জায়গা হতে পারে না। হয়ও নি। (এ হল) আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত। এখন ব্যাটারা বুঝেছে যে এ যা তারা করছে এটা suicide, এতে আমরাই মরব। এখন state government কী সব করছে-টরছে. . . কী হতে কী হবে, আমি কিছু জানি না। আমি backdated. ও-সব খবর আমি ভালো রাখি না।

তথ্যচিত্রের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা কাহিনীচিত্রে আরোপিত হয়। বলা যায়, পরস্পর পরস্পরকে প্রতিফলিত এবং প্রভাবিত করে।

তথ্যচিত্র মোটামুটি ভাবে দুটো ধারাকে অনুসরণ করেছে। একটি হচ্ছে রবার্ট ফ্ল্যাহার্টি-র— যাঁর 'Nanouk of the North'— এস্কিমোদের জীবন। আর-একটা হচ্ছে লন্ডনের Central film institute-এর। যেটার গুরু হচ্ছেন জন গ্রিয়ারসন। এই দু'জনের অধীনে documentary ছবি কাকে বলে, সেটা সারা পৃথিবী দেখেছে। 'Louisiana Story', 'Elephant boy'— ফ্ল্যাহার্টি-র এক দিকে এই সমস্ত কাজ, আর-এক দিকে British Film Board-এর 'Night mail', 'Song of Ceylone'. তারপরে যে-সমস্ত কাজ আধুনিক (কয়েক জন) করেছেন সেগুলো আমাদের প্রণম্য।

লেনি রিফেনস্টাল হিটলার-এর যুগে যে-কাণ্ড করে গেছেন, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ। তাঁর রাজনীতি সম্পর্কে প্রচণ্ড মানসিক আক্রমণ থাকতে পারে বটেই, কিন্তু শৈল্পিক দিক থেকে তাঁর গুণকে অস্বীকারের ক্ষমতা কোন শিল্পীর নেই। ১৯৩৬ সালে বের্লিন ওলিম্পিক-এ হিটলার-এর বদমাইশি সত্ত্বেও তিনি, এই মেয়েটি, ছত্রিশ জন ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে যা cover করেছিলেন, আমি মনে করি না কোন documentary filmmaker ঐ ধরনের কাজ গুছিয়ে তুলতে পেরেছেন।

(তথ্যচিত্র নির্মাণে বিশেষ কোন নীতির কথা বললে) সেটা হচ্ছে ফ্ল্যাহার্টি এবং গ্রিয়ারসন-এর একত্র ঘটনা। যেটা বেসিল রাইট 'Night mail' থেকে আরম্ভ করে 'Song of Ceylone'-এ— ব্যাপারটাকে জমিয়ে দিলেন।

ঐ ব্যক্তিটিকে আমি পুজো করি। দেখুন, documentary চলচ্চিত্র করতে গেলে অনেক বেশি ভালোবাসার প্রয়োজন। মানুষকে না-ভালোবাসলে কাজকম্ম হয় না। আপনারা ভাবেন, আমি feature filmmaker. কিন্তু এক বার analyse করে দেখুন তো, আমি কি মানুষের বাইরে কখনও গেছি? স্টুডিও-র অভ্যন্তরে আমার কোন ছবি হয়েছে?

আমার feature film এবং documentary— এ দুটোতে কোন তফাত নেই। আমি মনে করি না যে documentary বলে কোন বিশেষ পদার্থ আছে। documentary হচ্ছে মানবজীবনের document. মানুষকে ভালোবাসলে ও-দুটোর ভেদাভেদ থাকে না।

আমি তথ্যচিত্র সম্পর্কে খুব বেশি অবহিত নই। বেশ কয়েকটা করেছি বটে, কিন্তু সেগুলো পেটের দায়ে। তথ্যচিত্র করতে হলে একটা বিশেষ মানসিকতাও লাগে, যেটা আমার নেই। কাজেই আমার তথ্যচিত্রগুলো প্রায় প্রত্যেকটাই সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কাজেই আপনাদের তথ্যচিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা আমার ধৃষ্টতা হবে।

('My Lenin' ছবিটা নিয়ে) অসুবিধে নানান ঘটে গেছে। সেটা হচ্ছে. . . বলছি। মোরারজি দেশাই। আমার এই ছবি 'My Lenin' এখানে Censor Board থেকে pass করে এনে দিল্লিতে যায়। তখনও পর্যন্ত কংগ্রেস দু'ভাগ হয়নি। তো, ছবি দেখালাম। তারপর পোলিশ কালচারাল অ্যাটাশে, সে তো পাগল। সে বাংলা অসম্ভব ভালো বোঝে। এক্কেবারে ক্ষেপে গেল। তারপর রাশা, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া. . . সব বিক্রি হবে, তারপরে আমি. . . মোরারজি হচ্ছে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার, সে কী-একটা কাগজ পাঠিয়ে দিয়েছে। ইন্দিরাদি আমাকে বকল যে, এ ছবি তো banned, ঋত্বিক। আমি বললাম, তুই দিদি, কিছু কর একটা! এটা কী? What is this nonsense? Ridiculous! তখন হাকসার সাহেব, মানে যিনি almost my father, অসম্ভব ভালোবাসত আমাকে— he was then chief secretary to ইন্দিরা গান্ধি। He took it to মেরারজি। তখন এই মেয়েটা. . . হ্যাঁ, নন্দিনী— এখন গিয়েছে উড়িষ্যাতে, তখন ওখানে— আমাকে ডেকে বলে যে, ঋত্বিক, আমি কী করব? তুই কী কচ্ছিস কর। (আমি বললাম) হ্যাঁ, তুই ভাগ তো এখান থেকে। হাকসার সাহেব বেরিয়ে এসে বললেন, ইসি মে কোই গড়বড় নেহি, what is wrong with it? তখন রাশা-তে বিক্রি হল। এর মধ্যে কিন্তু সমস্ত Socialist country কিনতে চেয়েছে। এবং টাকা সোজাসুজি পাওয়া যেত। এবং পেলে আমার বৌ-বাচ্চারা একটু খেয়ে বাঁচত। এই মোরারজি— করে এটা বন্ধ করে দিল। Anyway, হাকসার সাহেব এবং নন্দিনী মিলে ঐ হাজার-তিরিশেক, না চল্লিশেক টাকা— অতটা আমার ঠিক মনে নেই— something like that, they managed. যাতে করে আমি তখন টাকা পাব এবং বদনাম কিনব, কিন্তু মাল খেতে পাব! আমার বৌ ক্ষেপে ব্যোম হয়ে যাবে তখন। ব্যাস্। This is part of life, cannot be helped. কিসু পয়সা

ওড়াইসি, ওড়াইয়া-পোড়াইয়া গিয়া fly back to Calcutta. বৌটাগো ক'টা টাকা দেবার জন্য বাওয়া! মানে অন্ততপক্ষে for a month. don't disturb. These are occupational hazards.

ভিয়েতনাম নিয়ে ছবি করব বলে ভেবেছিলাম, তার script হয়েছে এবং সে script ছাপাও হয়েছে, সবই হয়েছে। কিন্তু ছবি হওয়াটা তো চাট্টিখানি কথা নয়। ছবি করা গেল না।

এখন সে ভিয়েতনাম আর কোথায়? এখন আর ছবি করার কোন মানেই হয় না।

ছৌ আমাদের পুরুলিয়ার মানুষের একটা গভীরত্বের প্রশ্ন। আপনারা যদি পুরুলিয়ায় যান, যে-জেলাটা দরিদ্রতম, পশ্চিম বাংলায়, তাদের গাঁয়ের মধ্যে ঢোকেন, দেখতে পাবেন মানুষ কী ভাবে শিল্পকে ভালোবাসে। এদের মধ্যে গিয়ে আমি প্রেমে পড়ে গেলাম। এই সব মানুষজন কী ভাবে নাচ-কে ভালোবাসে, এই মুখোশগুলো তৈরি করে, দেখে আমি হতহারা হয়ে গেলাম। এদের ভালোবাসতে-বাসতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। আমি তিন বার পুরুলিয়ায় কাজ করেছি। প্রাথমিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জন্য একটা documentary করতে হল। তারপর প্যারিস থেকে ফিলিপ পার্যাঁ এল। তখন রঙের ছবি একটা করতে হল। তারপরে এই ছবিতে আমায় খাটতে হল।

ঘটনাটা হচ্ছে, আমার মাথার মধ্যে সব সময়ে একটা মাতৃমূর্তি কাজ করে। কোন এক বন্ধু বলেছেন যে, 'আপনাকে মায়ে খেয়েছে।' সেটা সত্যি। মায়ে আমাকে সত্যিই খেয়ে ফেলেছে। ছৌ-এর শেষটা দেখবেন, তাতে এই কথাটাই বলা হয়েছে।

আমার (শান্তিনিকেতনের) প্রধান অভিজ্ঞতা হচ্ছে একটি ব্যক্তির সঙ্গে— তার নাম হচ্ছে রামকিঙ্কর বেইজ। এই দু'জনে মিলে আমরা যে-সমস্ত মাতলামি করে বেড়িয়েছি এবং যে-ভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে-পড়তে পালিয়েছি, এগুলো লেখার খুব দরকার নেই।. . .

রবিবাবু সকালবেলায় আসতেন আম্রকুঞ্জে। সেখানে প্রতি দিন সকাল-বেলায় উনি যে-ভাষণগুলো দিতেন, সেগুলো কেন যে ছাপা হয়নি, আমি জানি না। এবং ও-রকম একটা চেহারা দেখা যায় না। আর ঐ যে ভাষণ-

গুলো দিতেন, সে ভাবা যায় না। কিন্তু এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারব না।

উনি যে-দিন মারা গেছেন, তখন আমি— আমাদের বাড়ি ছিল এই বকুলবাগানে। আমার বোন পড়ত বেলতলা Girls' School-এ। ঐখানে খবর পেলাম যে উনি মারা গেছেন, তখন ছুটলাম এবং প্রচণ্ড ভিড়। পেছন-পেছন গেছি, এই অব্দি।. . .

(প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এখনও) সব কিছু (পেতে পারেন)। রবীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্র গুপ্ত নাম দিয়ে, আমি নাম বলব না, আমাদের এক কমরেড 'মার্কসবাদী' মাসিকে. . . if you remember যে রবীন্দ্রনাথকে decry করা—। ওটা হচ্ছে বি.টি. রনদিভে-র period-এ। আমাদেরকে, প্রত্যেক পার্টি কমরেডকে বারণ করে দিয়েছিল. . . এবং যাচ্ছেতাই গালাগাল রবীন্দ্রনাথকে, যে বুর্জোয়া. . . this and that. সে দিন আমি একটি মেয়েকে পড়াতুম, শোভা সেনের ছোট বোন ইলা। মানে ও I.A. পড়ত, আমি টিচারি করতুম। ইলার কাছে আমি বলতে গেছি এই রবীন্দ্র গুপ্তের number 5 'মার্কসবাদী', মেয়েটা ক্ষেপে বোমা হয়ে গেল। রবিবাবু আমাদের রক্তের মধ্যে ঢুকে আছেন। রবিবাবু ছাড়া কোন দিকে যাওয়া যায় না। শিল্পের যে-দিকে যাবেন আপনারা—। এই যে মেয়েটা ক্ষেপে বোমা হয়ে গেল, মানে that is the reaction. রবীন্দ্রনাথকে ছেড়ে বাঙালিরা বাঁচতে পারে না। কাজেই ওটা কোন আলোচনাই নয় যে কোন শিল্পী, বাঙালি শিল্পী. . .

(উদাহরণ) গুচ্ছের দেখাতে পারি এক্ষুনি। এখানে বসেই। হাতের কাছে কোন বই-টই নেই, তবু আমি দেখাতে পারি। রবীন্দ্রনাথকে উদাহরণ দেখিয়ে আজকের লোকের কাছে আমাকে convince করানো, এটা অত্যন্ত লজ্জা-কর এবং নিচু ধরনের কাজ। রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। পৃথিবীতে এত বড় শিল্পী, মানে তিন-চারটে জন্মেছে। কাজেই তাঁর তো চিন্তা কত দিকে! তাঁর মরার সময়ে শেষ যে-লেখা 'সভ্যতার সংকট', ওটা আপনারা পড়ুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন যে, যারা এ সমস্ত— যদি কেউ বাঁদরামি করে, সে বাঁদরামিগুলোর কোন মূল্য নেই। শেষ অব্দি একটি কথাই, এটা একেবারে মানে আমার মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে যে, 'মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ।' কাজেই আমি বিশ্বাস হারাব না। অর্থাৎ বিশ্বাস হারানোর সমস্ত সুযোগ ঘটে গেছে। কিন্তু it is a crime, তা-ই আমি বিশ্বাস হারাব না। 'Crisis of Civilization', ইংরেজিতে translation আছে ওর, এগুলো তো . . . কাজেই কী বলব! রবীন্দ্রনাথ is a vast ocean. . . মহাসমুদ্র। তাঁকে

তো এক কথায় ছোট করে কিছু বলা যাবে না। এবং যদি কেউ কিছু (বাঁদরামি) করার চেষ্টা করে, তাদেরকে আমার হয়ে বলে দেবেন যে তাদেরকে আমি ধরে— পেলে— জুতিয়ে খাল খেঁচে দেব।

(ইন্দিরা গান্ধির ওপর প্রামাণ্য ছবি করা নিয়ে) আমার স্পষ্ট করে কিছুই বলার নেই. . . ছবিটা আদ্দেক হয়ে পড়ে আছে, যদি শেষ হয়— ছবি যখন বেরোবে, তখন কেন করতে চেয়েছিলাম, পরিষ্কার দিনের আলোর মতো হয়ে যাবে। এবং স্ববিরোধিতা কি না, ওটাই প্রমাণ করবে। Artist-এর কাছে এ সব প্রশ্ন করে লাভ নেই, খালি একটাই কথা যে, wait করো। See it and then condemn it. . . অভিসন্ধিমূলক কথার উত্তর দেওয়াটা ঘৃণ্য। ছবিটা আমি যদি শেষ করি, ছবিটা দেখলেই যদি বোঝা যায় যে, আমি অভিসন্ধিমূলক কাজ করছি, কী আমি compromise করছি, কী আমি স্ববিরোধিতা করছি, তখন আমাকে তুলে খিস্তি করো। তার আগে যেটা হয়নি, হবে কি না তা জানা নেই— সম্ভাবনার ওপর তো বলা যায় না!

সমালোচক হচ্ছেন সেতু। তাঁর কর্তব্য শিল্পীকে অনুধাবন করা এবং সে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা দর্শকের কাছে ব্যক্ত করা। এ ভাবে শিল্পী যেমন নতুন পথের সন্ধান পেতে পারেন, তেমনই দর্শকও ক্রমশ বেশি পরিমাণে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেন। অবশ্য এর জন্য সমালোচক গভীর ভাবে চিন্তা করবেন এবং তাঁর দায়িত্বপালনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন।

সমালোচনার ভূমিকা অত্যন্ত important. ভীষণ ভাবে। সমালোচকটা কে? সমালোচক তো নয়— এ হচ্ছে দর্শক আর সৃষ্টিকর্তা, তার মাঝখানের সেতু। কিন্তু আমাদের দেশে সে রকম সমালোচক কেউ নেই। যাঁরা দু'এক জন আছেন, তাঁরাও হচ্ছেন বিক্রীত। কারণ, এ সব ব্যবসাদার কাগজঅলা এখানে. . . হ্যাঁ, তারা তাঁদের কিনে রেখে দিয়েছে। কাজেই তাঁরা ভয়ের চোটে লিখতে পারেন না। তাঁদেরকে প্রতি মুহূর্তে এই সব কথা শুনতে হয়। আর সমালোচনার মূল্য যে কী আছে, সেটা আপনাদের আমি বোঝাতে পারব না। দেখুন, একটা কথা বলি, জর্জ বার্নার্ড শ 1898-এ সমালোচনা করতে আরম্ভ করেন নাটকের। তখন তিনি নাট্যকার ছিলেন না। ওঁর লেখায় সমস্ত লন্ডন শহর সম্পূর্ণ ভাবে ঘুরে গিয়েছিল। ঐ হচ্ছে লেখা। এখানে লিখতে সাহস পায় না কেউ। যাঁরা পেত, পারত, আমি যতখানি জানি. . . মাত্র দু'জনের কথা। সরোজ সেনগুপ্ত, ও seriously লিখত। ওকে তাড়িয়েছে।

আর জানি যে. . . কী বলে. . . ঐ যে 'আনন্দবাজারে'. . . (জ্যোতির্ময়) না. . . না, না, এন.কে.জি. নয়। ঐ যে, ঐ ভদ্রলোক। মানে, just now I am missing the name, ঠিক আছে, মনে পড়লে আমি বলব, these are the two critics. আর শ্যামলাল, যে 'Times of India'-র editor এখন। সে প্রথমে film critic ছিল। এখন ওকে সরিয়ে দিয়ে editor করে বসিয়ে দিয়েছে। That resulting into যে ওকে এখন editorial লিখতে হচ্ছে। শ্যামলাল এ বছর পদ্মশ্রী না কী-একটা পেল। এরা আমার বন্ধু। তো, এই হচ্ছে ঘটনা। এ দেশের সমালোচকদেরকে শ্রদ্ধাভক্তি করার কোন লোক নেই। যা দু'চারটে লোক ভদ্র ভাবে সত্যিকারের কাজ করার চেষ্টা করেন, তাঁদেরকে কী ভাবে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়া যায়, এই হচ্ছে একমাত্র চিন্তা। আর বাকি(দের) সম্পর্কে আমার বলে লাভ আছে কি? Film criticism-এ film বোঝার একটা ব্যাপার থাকে। ফিল্মের different aspects, তার technical details বোঝার ক্ষমতার একটা ব্যাপার থাকে তো? এঁদের সে সব কতখানি আছে, তা ওঁরাই জানেন। আমার বলার দরকার নেই। আমি not going to be involved into any problem. কিন্তু, point is that I have understood this. ওটা কোন. . . সেই ভদ্রলোকের নাম আমি ভুলে গেলাম, he is the best in India. . . আরে, 'আনন্দবাজার'-এ. . . এখন 'দেশ'-এ বসিয়ে রেখেছে ওকে।

সেবাব্রত না। কী আশ্চর্য! নাম-টাম আমার এমন miss হয় মাঝে-মাঝে।

কলকাতায় ৩ ধরনের film journalist আছে। এক হচ্ছে তথাকথিত national papers, এখানকার film journalist-রা মোটাসোটা মাইনে পান, আর-এক হচ্ছে প্রসাদ-উলটোরথ জাতীয় সাংবাদিক, রগরগে খবরেই তাঁদের উৎসাহ, বেশির ভাগ ঐ actor-actress নিয়ে। আর তৃতীয় হচ্ছে film society-র আশেপাশের লোকজন, যাঁরা কাগজ বের করেন, ফিল্মটাকে seriously নেবার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে প্রথম দুটো group সম্পর্কে বলে কিছু লাভ নেই। (তা বাদে) ছোট-ছোট অনেক কাগজ বেরোয়, আমার লেখাও মাঝে-মাঝে বেরোয় শুনেছি, লেখা নিয়েও যায় আমার কাছ থেকে। কিন্তু সত্যি বলছি, ম্যাগাজিন আমি বিশেষ পড়ি না। খুব বেশি আমি পড়ি না, তবু আমার সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে এই সব কাগজের role অত্যন্ত progressive. মধ্যে-মধ্যে অনেক লেখা দেখি যাতে কাঁচা তারুণ্যের উচ্ছ্বাস। আমি বলছি, কাজেই ভুল হোক বা ঠিক হোক, আমি বলছি— এই ধরনের ছেলেমানুষি কিছু-কিছু ছেলেপিলের লেখার মধ্যে থাকে, এগুলো খুবই

স্বাভাবিক, এগুলো তারুণ্যের ধর্ম। সময়ে-সময়ে অত্যন্ত ভালো লেখাও চোখে পড়ে, অত্যন্ত serious লেখা। দেশবিদেশের বিভিন্ন শিল্পীরা যে-সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তার সঙ্গে ফিল্ম-সোসাইটিগুলি এখানকার অনেক মানুষের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। আর এই সব লেখা, ছবির আলোচনা, বুদ্ধিমানের মতো লেখা— এ সবের ফলে একটা পাঠকগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে, যাঁরা বুঝতে পারছেন কোন্‌টা ঠিক, কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল। সে দিক থেকে contribution নিশ্চয়ই আছে।

মিকেলাঞ্জেলো বুয়োনারোতি-র কতগুলো বিখ্যাত mural আছে, তাকে বলা হয় Umbrian angel. পরিচালক ফেলিনি তাঁর ছবির বাচ্চা মেয়েটিকে ইচ্ছে করে (একমাত্র শেষ দৃশ্য বাদে) বার-বার profile-এ রেখে মেয়েটির নাক-মুখ-চিবুক-কণ্ঠনালীর সাথে মিকেলাঞ্জেলোর আমব্রিয়ান এঞ্জেল-এর একটা মিল আনার চেষ্টা করেছেন। আমব্রিয়ান এঞ্জেল-এর কথা মনে পড়লেই আমরা বুঝি যে, ঐ বাচ্চা মেয়েটি অন্য সব creatures of darkness-এর চাইতে কত আলাদা, একেবারে reverse. আমাদের ধারণা তীব্রতর হয় (এ রূপ cross reference-এ) ছবিটি ব্যাপ্তি লাভ করে।

সাহিত্য বা অন্য শিল্প-সমালোচকদের থেকে ভিন্ন কোন বিশেষ দায়িত্ব চলচ্চিত্র-সমালোচকদের আছে, এমন কথা বলা চলে না। সব শিল্প-সমালোচকদেরই দায়িত্ব থাকে। ধরুন, জাপানি ছবি 'Seven Samurai'-এর সমালোচক যদি তদানীন্তন জাপান, তার সামাজিক ইতিহাস, সামুরাইদের জীবন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না-হন, তবে ছবির রসগ্রহণ করতে পারবেন কি? বা, বার্গম্যানের 'Virgin Spring' দেখার সময় আমাদের 12th century-র সুইডেন সম্বন্ধে ধারণা থাকলে ভালো হয়।

আপনি যদি সমালোচক হন, তবে বিশেষ করে তা আরও প্রয়োজন। ইয়োরোপের মধ্যেও সবচেয়ে শেষে যে-সব দেশ Christianity গ্রহণ করে, তার মধ্যে অন্যতম সুইডেন। Christianity গ্রহণ করার আগে সুইডেনে Viking philosophy-র খুব প্রচলন ছিল। Pagan philosophy-র সাথে লড়াই করে আস্তে-আস্তে Christianity কী ভাবে বিস্তার লাভ করে, তার উপর লেখা অসংখ্য ballad-এর একটিকে কেন্দ্র করে এই 'Virgin Spring' রচিত। Pagan philosophy কী, বা Viking philosophy কী— এর সাথে Christianity-র বিরোধ কেন বা কোথায়— এ না-জানলে ছবির মূল theme আপনার অগোচরে থেকে যাবে।

হ্যাঁ, একটা চমৎকার ছবি দেখলাম, এই দৃশ্যগুলি ভালো বা এই shot-

গুলি ভালো, এ কথা লিখলে তো সমালোচনা হল না। সমালোচককে ছবির বিষয়ের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হতে হবে। শিল্প সব সময়ে যে-দেশের background-এ রচিত সেই দেশের মাটিতে শিকড় গাড়ে, তাই সেই ছবি থেকে রস গ্রহণ করতে হলে সেই দেশের মাটির, লোকের, সমাজব্যবস্থার কথা না-জানলে কি চলে?

দেখুন না, বাইরের বিদেশি সমালোচকরা 'অপরাজিত' ছবির কত প্রশংসা করে। কিন্তু 'অপরাজিত'তে যে একটা কালপুরুষের প্রসঙ্গ আছে, তা কি সঠিক ভাবে বিদেশিরা উপলব্ধি করতে পেরেছে? ভারতীয় দর্শনে, উপনিষদে আছে যে, কালপুরুষ যাকে ভর করে সে ঘরছাড়া হয়ে যায়, ভবঘুরে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কোথাও বাসা বাঁধতে পারে না। বিভূতিবাবুর প্রায় সব লেখাতেই এই কালপুরুষের প্রসঙ্গ আছে। ছবিতে এক জায়গায় অপু জলের মধ্যে কালপুরুষের ছায়া দেখে উচ্চারণ করে, 'কালপুরুষ'। যেন বিবাগী জীবনের ইশারা। বিদেশি সমালোচক translate করল Orion, কিন্তু এতে গভীরতা স্পর্শ করল কি? দার্শনিক ব্যাপ্তির সামান্য কথাও কি ঐ কথাতে কানে এসে বাজল? আমার মনে হয়, না।

জর্জ শাদুল 'সুবর্ণরেখা'কে explain করে দিতে বলেছিলেন। কেননা, দেশবিভাগের ব্যথা হয়তো ইয়োরোপ বুঝবে না। আমরা কি বুঝি Second World War-এর intensity, এ জন্যেই তো পোল্যান্ডের entire history পড়ি। যদি না-পড়তাম তবে আমরা 'Ashes and Diamonds' বুঝতে পারতাম না।

(ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের) ভূমিকা নিশ্চয়ই আছে, ভালো এবং খারাপ, দুই-ই। ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের ফলে এ দেশের লোক দেশবিদেশের বহু ছবি দেখতে পাচ্ছেন, এর মধ্যে বহু চিন্তাশীল লোক, ছাত্র, যুবক এবং অন্য ধরনের মানুষও আছেন। লোকে এ সব ছবি দেখছে, দেখে বুঝছে ছবি এখন আর ফ্যালনা ব্যাপার নয়, সাহিত্যের চেয়ে ছবির মধ্যে দিয়ে অনেক বেশি বলা যাচ্ছে, বলছেন বিভিন্ন শিল্পী। ফলে একটা নতুন বোধ আসছে, রুচি পালটাচ্ছে আস্তে-আস্তে। আমরা ছবি করতে সাহস করছি, আর ঐ আগে young audience-এর কথা বলছিলাম, তাদের ছবি নিয়ে যে এই প্রচণ্ড আগ্রহ, সে ব্যাপারে film society movement-এর contribution অনেকখানি। সে দিক থেকে একে hail করা উচিত, অভিনন্দন জানানো উচিত।

খারাপ দিক হচ্ছে, ঐ censorship তুলে নেওয়ার ফলে কিছু বাজে লোকজন এ সবের মধ্যে ভিড় করছে। আমি ছবি বিশেষ দেখি না, তবে 'ঐ' সব ছবি নাকি অনেক আসে-টাসে বলে শুনেছি, আর ঐ ধরনের ছবি

দেখতে যারা ভিড় করে তারা শিল্প করতে যায় না। তা এ ব্যাপার avoid করা যায় না, ভালোর সঙ্গে কিছু খারাপ থাকবেই।

আমাদের দেশের censorship, আপনারা বোধ হয় জানেন না, সম্পূর্ণ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। যে যখন কর্তা হন, তিনি যা ভালো ভেবে বসেন, তা-ই করেন। কাগজে-কলমে কতকগুলি নীতির কথা লেখা আছে বটে, কিন্তু সেগুলি কার্য-ক্ষেত্রে প্রয়োগ মোটেই করা হয় না। এ ছাড়া Censor Board-এর Advisory Committee-তে ফিল্ম ছাড়া অন্য সব জগতের লোককে রাখা হয়। এ নিয়ে আমার মনে প্রশ্ন আছে— রুচির প্রশ্ন। এঁরা কে কতখানি ছবি বোঝেন সে সম্পর্কে আমার ধারণা খুব স্বচ্ছ— এঁদের ছবি বোঝার ক্ষমতা খুবই কম। অথচ এই Censor Board-ই কোন্ ছবি কী ভাবে দেখাতে হবে, তার ব্যবস্থা করেন। ফলে আমাদের দেশে যে-ধরনের censoring চলছে, তাকে এক কথায় বলা যায়, বিচিত্র।

(ফিল্ম সোসাইটির show-এ uncensored ছবি দেখা) এই সব বাঁদরগুলো, কিছু মনে করবেন না আমার ভাষা, এরা অভদ্র ছবি দেখার জন্যই প্রস্তুত। আমাদের যুগে যে-ধরনের ছেলেপিলে ছিল, এখন সেই চরিত্রের ছেলেপিলে নেই। এরা আপনাদের কাছ থেকে অভদ্র ছবি দেখারই চেষ্টা করবে। এবং আপনারা দেখাবেন। কারণ, আপনারা তো . . . ঐ থেকেই আপনাদের তো ব্যবসা করতে হবে। এখন তো ফিল্ম সোসাইটি has become a ব্যবসা। যেটা আপনাদের decry করা উচিত। আপনাদের তো ঘৃণা করা উচিত। সেটা আপনারা করেন না, বুঝেছেন কমরেড? দেশটাকে উচ্ছন্নে দেবার যা-যা চেষ্টা, সব ক'টা সব দিক থেকে হচ্ছে। আমি না-হয় মদ খেয়ে মদ্যপ হয়েছি। এবং কিছু-কিছু লোক জানে যে আমি মদ খাই। এবং আমি লুকিয়ে-চুরিয়ে কোথাও খাই না। কিন্তু আপনাদের উচিত হচ্ছে আক্রমণ করা। দেখুন, আমি এবং সত্যজিৎ. . . আপনাদের এই ফিল্ম সোসাইটি. . . আমরা দেখতে যাই না। আমরা দেখতে যাই-ই না। কারণ এখন যে-সমস্ত ছবি দেখানো হচ্ছে এগুলো কোন ভদ্রলোককে দেখানো যায় না। আমি আমার মেয়ে, আমার বৌকে দেখাতে চাই না। আপনাদের লড়াই করতে হবে। যাক, আমি পারি না। আমি তো straight cut out করেছি। যেটা আমার হাতে আছে, that you know. That much I can do. কিন্তু point হচ্ছে যে আপনারা তো ঐ সব জায়গায়. . . (এ সব) বোঝাটোঝার ব্যাপার নেই, সোজা বন্ধ করার ব্যাপার। আপনারা ভেবেছেনটা কী?

(ফিল্ম 'সোসাইটিগুলোর বিকল্প কর্মসূচি হতে পারে) আলোচনা, সভা, কথাবার্তা সব বলা, এবং মানুষের রুচি জাগ্রত করা এটাও একটা ব্যাপার আছে। এই। That is all. (কিন্তু) ঐ সমস্ত horrible জিনিশপত্তর দেখার কোন মানেই আমি বুঝি না। প্রাথমিক ভাবে মিজোগুচি, ওঁর print আনা (প্রয়োজন)। তারপরে ইতালি থেকে. . . ফ্রান্স থেকে. . .। এখন ইংল্যান্ডেও লিন্ডসে-ফিন্ডসে কিছু কাজ করছে, সেগুলো। রাশা থেকে তারকভস্কি-র কাজ. . . পোল্যান্ড থেকে আন্দ্রে ভাইদা. . . ওঁর ছবি। আমেরিকা থেকে শার্লি ক্লার্ক. . . ওদের কিছু কাজ। It will run for a year.

(সাধারণ ভাবে বাংলা ছবির যে-artistic standard সেটা) এখন খুব নিচু স্তরের। (সেটাকে improve করার জন্য) FFC-ই এখন রাস্তা আর এই Film Development Board.

(FFC-র লোন সকলে) পাচ্ছে না তো যারা পাচ্ছে না তারা deserve করে না। টম ডিক অ্যান্ড হ্যারি পাবে, এমন কোন কথা নেই। Film Development Board যদি সে ভাবে টাকা যাকে-তাকে দেয়, তা হলে দু'দিনে তো লাটে উঠে যাবে। পাচ্ছে না মানে কী। পৃথিবীতে সব্বাই artist হয় না। এক লক্ষের মধ্যে একজন artist.

FFC এ পর্যন্ত অন্ততপক্ষে, আমি ঠিক exactly এর পরিসংখ্যানটা বলতে পারব না, তবে জন্ম থেকে গোটা-ষাটেক ছবি finance করেছে। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলতে কী, আগে যাদের নাম ছিল এমন লোকের মধ্যে একমাত্র মৃণাল সেন এবং আমিই সাহায্য পেয়েছি। আর কোন তৃতীয় ব্যাক্তি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিতদের মধ্যে কেউ পায়নি। আর প্রতিষ্ঠিত সব নতুন-নতুন ছেলে তাদের মধ্যে more than 75 per cent যারা ছবি করতে গিয়েছিল, টাকা মেরে পালিয়েছে, straight টাকা মেরে হাওয়া হয়েছে। যেমন একজনের নাম বলছি, অচলা সচদেব বলে একজন actress আছেন, তাঁর স্বামী, জ্ঞান সচদেব। আড়াই লাখ টাকা advance নিয়ে বসে আছে। ফেরত নেওয়ার কোন উপায় নেই। এই ভাবে ছয়লাপ করছে। আর তারা যে নতুন ছেলেদের টাকা দেয়নি, তা-ও না। আমারই student, gold medalist from Film Institute of Puna, মণি কাউলের দু'দুটো ছবিকে finance করেছে এবং ওর দুটো ছবিরই যথেষ্ট নাম হয়েছে। He has established himself, not only that, এ বছর Frankfurt Film Festival-এ যে-seminar হয় সেখানে jury হয়ে সে গিয়েছে। এত কিছু সম্মান সে পাচ্ছে। কুমার সাহানিকেও FFC

একটা ছবি করতে দিয়েছে। সে ছবিটা এখন release হয়নি। কে বলেছে নতুন ছেলেদের দেয় না? একজন দু'জন এখানে-ওখানে তড়পে বেড়াচ্ছে।

এখানকার মধ্যে, আমি যত দূর জানি, পূর্ণেন্দু পত্রীকে ওরা দেয়নি। সে জন্যই এত সব ব্যাপার। কিন্তু he is not a new director. সে 'স্বপ্ন নিয়ে' বলে একটা ছবি করেছিল। তারপর এখন 'স্ত্রীর পত্র' করেছে। কাজেই তাকে— You cannot say, he is a new one. (কিন্তু তার অভিযোগটা খুব বড় করে দেখানো হয়েছে) because he works in আনন্দবাজার। তারা ওটা নিয়ে নাচানাচি করেছে। তাতে কিছু যায়-আসে না। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের কিস্‌সু যায়-আসে না। আনন্দবাজার তো হচ্ছে একটা fascist organisation, fascist-ও নয়, CIA-র agent.

(এটা) off the record কেন, on the record. I shout from the housetops, from the housetops to the street— আজকে তোমাদের এখানে off the record করতে যাব কী জন্য?

(FFC-র loan নিয়ে) মণি কাউল ছবি করেছেন, ছবিটা ভালো হয়েছে এবং সম্মান পেয়েছে। তাঁকে FFC টাকা না-দিলে তিনি ছবি করতে পারতেন না। মৃণাল সেন নতুন ছেলে নন, কিন্তু মৃণাল সেন যদি FFC-র টাকা না-পেতেন, তাঁর 'ভুবন সোম' হত না। বেদি পুরনো লোক, 'দস্তক' ছবি তিনি করতে পারতেন না, যদি FFC টাকা না-দিত।

সুতরাং নতুন director পুরনো director, এ সব foolish কথাবার্তা।

বড় কথা হচ্ছে, ভালো ছবির জন্যে যাকে দেওয়া উচিত তাকেই দেওয়া উচিত।— পুরনো director যদি ভালো script নিয়ে হাজির হয়, (তাকে) নতুন director যদি ভালো script নিয়ে হাজির হয়, তাকেও।

এখানে পুরনো-নতুনের কোন ব্যাপারই নয়— ব্যাপার হচ্ছে, এ দেশে ভালো ছবির একটা আন্দোলন, একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া।

(FFC-র loan দেবার নীতির ক্ষেত্রে) আমি মনে করি যে (নতুন ও পুরনো পরিচালক, এ) দুটোকে একটা মিশ্রণের প্রশ্ন আছে। নতুন ছেলেপুলেকে কাজকম্ম দিতেই হবে এবং তার জন্য FFC-র টাকা যেটুকু দেওয়া সম্ভবপর সব সময় দেওয়া উচিত। That is one part.

কিন্তু পুরনো যারা কাজকম্ম seriously করতে চায়, তাদেরকেও সাহায্য করা উচিত। দুটোই এক— এটাকেও তো মানে গুলিয়ে ফেললে চলবে না।

আমার অভিজ্ঞতায় চলচ্চিত্রের দুরূহতম দিক একটিই এবং আর কিস্যু নেই। সেটা হচ্ছে, পয়সা যোগাড় করা। Cash manage করা হচ্ছে একমাত্র দুরূহতম দিক। বাকি আমার দেশের technicians, my workers, এরা. . . এবং my artists, এরা যে প্রাণ দিয়ে দেবে— একটা ভালো কাজ করার জন্য। কিন্তু ঐ cash manage করা হচ্ছে point. এ একমাত্র, nothing else.

(কেন) আর কী? সমাজব্যবস্থা। সেটা বলতে গেলে আবার আপনার Marxism আওড়াতে হয়। এই সব. . . বাচ্চাগুলো, এরা cash নিয়ে বসে আছে এবং যত রকমের বাঁদরামি, বদমাইশি, ইতরামি সমস্ত কিছু করছে। অ্যাঁ. . . এরাই হচ্ছে আসল পার্টি। এই পার্টিগুলোকে off করতে পারলেই হয়ে যায়। এবং এই ব্যবসাদারগুলো হচ্ছে. . . দেখুন মশায়. . . আপনারাই বলুন. . . আমাদের এগারো হাজার কোটি টাকা white move করছে এই ভারতবর্ষে। তেত্রিশ হাজার কোটি টাকা black-এ move করছে. . . আমাদের দেশে সমস্ত movement-টা হচ্ছে black-এর ওপর level-এ।

(শুধু) ফিল্ম নয়, সমস্ত. . . আমাদের সমস্ত সমাজ, আমাদের সমস্ত economy, এই black marketeers-এ, এই যে black money, এ একেবারে ছেয়ে ফেলেছে আমাদেরকে। মানে, from all sides. এবং সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াও admit করছে। আজকে টাকার দাম নাবতে-নাবতে, চ্যবন বলেছে যে ৩৬ পয়সায় নেবেছে। Actually নেবেছে ২৫ পয়সায়। ১ টাকার value is 25 paise only. মানুষ খেতে পাচ্ছে না, এই যে দুর্ভিক্ষ. . . সমস্ত ব্যাপারটা হচ্ছে যে, একটা bare up করে দিয়েছে। আমি আর কী বলব? কাজে-কাজেই ফিল্মটা একটা কোন particular point না। ও-ই হচ্ছে ঘটনা।

Distribution এবং production (ফিল্মকে) আঘাত করছে না। করছে exhibition. আপনাদের exhibition সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। আমাদের দেশে exhibition trade, এটা যে কী জঘন্য, মানে কী ধরনের ইতর ব্যাপার, এটা আপনারা দয়া করে একটু বোঝার চেষ্টা করুন। আমি এই কথা বহু বার বিভিন্ন জায়গায় এবং ভারতবর্ষে সরকারি চাকরিতে যারা আছে, বড় থেকে আরম্ভ করে সব্বাইকে বলে এসেছি যে exhibition trade-টাকে manage করতে হবে। এরা যে কী ধরনের পাজি, কী রকম বদমাইশ, সে আপনারা জানেন না এবং সে সমস্ত ঘটনা বলে কোন লাভ নেই। কারণ এতে কিছু হবার নয়। Distribution-এর মধ্যেও বদমাইশি আছে, production tarde-এ এতখানি নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে, মশায়, আসল কথা যে এই exhibition যে কী, মানে কী ভাবে মানুষে মানুষ খুন করে যাচ্ছে, সেটা আপনাদের

ভালো করে বোঝা উচিত। শিল্প আর অমুক আর তমুক, ওগুলো কাজের কথাই নয়। Exhibition trade সারা ভারতবর্ষকে চুরমার করে দিয়েছে।

(মূলধনের প্রতি সিনেমার নির্ভরতা) বিষয়টি এর প্রচণ্ড ক্ষতি করছে, কিন্তু একে অতিক্রম করার কোন উপায় নেই। ব্যবসাদারদের দাবিকে মেনে নিতেই হবে, কিন্তু শিল্পীকে নিজের চারিত্রিক বলও অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

প্রকৃত সমস্যা সমাজব্যবস্থার সমস্যা। সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ বদল করতে না-পারলে অর্থাৎ সত্যিকারের সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তুলতে না-পারলে এ সমস্ত কাজ হবে না। ফিল্ম সোসাইটি বা আর্ট থিয়েটার একটা আঁচড় কাটতে পারে মাত্র। কিন্তু সমস্যাকে সমাধানের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা এদের একেবারেই আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে চেষ্টা করতে কোন দোষ নেই, চেষ্টা চলুক, আমাদের পরিপূর্ণ সহানুভূতি আছে।

বর্তমান যুগে দু'ধরনের ছবি হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে মানুষকে খুশির আনন্দে ধুইয়ে দেওয়ার জন্য নানা প্রকার দৃশ্যাবলি এবং নারীর মূর্তি দেখানো প্রয়োজন, আর-একটি হচ্ছে খেটে-খাওয়া মানুষের সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা। এ দুটোর মধ্যে লড়াই হোক। দুয়ের জন্য সমপরিমাণে অর্থ ব্যয় হোক। তার পর বোঝা যাবে কে জেতে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ব্যাপারটার সমাধান হোক। আমি জানি, কী ঘটবে।

বাংলা ছবি ক্রমশই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছে। জানি না, এই নিম্নগতি শেষ হবে কবে। কোথাও এতটুকুও আশার আলো দেখছি না। শক্ত মেরু-দণ্ডঅলা একটি ছেলেও দেখছি না, যে এসে বুক পেতে দাঁড়াবে প্রতিরোধের ভঙ্গিমায়। এর চাইতেও বড় হতাশা, বড় tragedy হচ্ছে এই, যে যাঁরা এক দিন বুক ঠুকে পাঁয়তারা মেরে বলেছিলেন, যা-কিছু জীর্ণ-দীর্ণ, যা-কিছু সনাতন পুরাতন সংস্কার আমাদের অগ্রগতির পথরোধ করে বসে আছে, তার বিরুদ্ধেই আমাদের আপোসহীন সংগ্রাম, এর জন্য যা মূল্য দিতে হয় দেব, চোখের সামনে দেখলাম তাঁরা একে-একে নিজেদের বিক্রি করে দিলেন সনাতনী গতানুগতিকতার কাছে। নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিকিয়ে দিয়ে জোর-গলায় জাহির করে বেড়াচ্ছেন, এটাই নাকি বিধিলিপি।

(আমি) বরং এমনতরো হারের খেলায় তাদের সঙ্গে যোগ দিইনি বলে আজ অপাঙ্‌ক্তেয়, আজ আমি তাদের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা।

তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে গেলে আমার সমস্ত বিশ্বাসের মূল উপড়ে ফেলতে হবে। বিশেষ করে আমার নিজস্ব আদর্শের ভিত্তিকে অস্বীকার করতে হবে। আমি জগৎটাকে দেখি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে। তার সঙ্গে যে সবাই একমত হবেন সে আশাও করি না, প্রয়োজনও বোধ করি না। তাঁরা তাঁদের চিন্তা নিয়ে থাকুন, আমি আমার চিন্তা নিয়ে থাকব। কিন্তু শত্রু হোক, মিত্র হোক, এমনকী তৃতীয় পক্ষও যদি হয়, একটি বিষয়ে আমি বড় নির্দয়— সেটি হচ্ছে মানুষের বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা। যখন ছবি দেখে বুঝতে পারি লোকটা মানুষকে ভালোবাসে না, মিথ্যে অভিনয় করে আসর মাত করছে, সে ক্ষেত্রে ক্ষমা করা দূরে থাক, কোন রকম আপোস-পন্থী মনোভাব প্রদর্শনেও আমি নারাজ। কিছু-কিছু শক্তিশালী কর্মী এখন তাঁদের শক্তিকে ব্যবহার করছেন মানুষের বিরুদ্ধে, এমন সন্দেহও আমার আছে তাঁদের সম্পর্কে।

অস্বীকার করব না যে ইতিমধ্যে গড়পড়তা যতগুলি ছবি তৈরি করা আমার উচিত ছিল, তা আমি করে উঠতে পারিনি। অর্থনৈতিক সাফল্যের অভাব কিছুটা দায়ী হলেও আসল কারণ সম্পূর্ণ অন্য। এর সঙ্গে অনেক সমস্যা জড়িত আছে। তবুও পদে-পদে যে-সমস্যার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি বাধা পেয়েছি, সেটা হচ্ছে চিত্রব্যবসার সঙ্গে জড়িত বিত্তশালী এবং প্রভাবশালী বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আমার প্রতি ব্যক্তিগত আক্রোশ। কারণ অন্যান্য অনেক পরিচালকের মতো আমি আমার কাজের ব্যাপারে কারও হুকুম মেনে চলি না। কিংবা কারও কাছে নতিস্বীকার করি না। তাই আমাকে অপাঙ্‌ক্তেয় করে তোলার ব্যাপারে এঁদের কারসাজির সীমা নেই। আরও মজার ব্যাপার এই যে, এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আমার এমন কয়েক জন সহকর্মী, যাঁদের সঙ্গে মিলে আমরা এক সংগ্রামে নেমেছিলাম।

(এ ধরনের মনোবৃত্তির মূল) কিছুটা যে (হিংসা) নয়, এ কথা বলা চলে না। তবে তার চাইতে বেশি যেটা আমার মনে হয়, সেটা হচ্ছে এই যে তাঁদের নিজেদের আত্মগ্লানির প্রধান দর্শক আমি। তাঁদের সঙ্গে মিলে আমিও কেন নিজের লেজ মুড়িয়ে দলে ভিড়লাম না— এটাই হচ্ছে আমার প্রতি তাঁদের বিদ্বেষের কারণ।

(অভিযোগটা যে নিছক কল্পনা নয়) তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, আমি যাতে কোন ছবি পরিচালনার কাজ না-পাই তা নিয়ে তাঁদের গোপন কার্যকলাপের শেষ নেই। আমার প্রতিটি কার্যসূচি, প্রতিটি পদক্ষেপ এঁরা নজরে রাখেন। আমার অবর্তমানে ছবির প্রযোজক বা distributor-দের কাছে এমন অভিযোগ করে আসেন যাতে আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

আমি নাকি মাতাল। চব্বিশ ঘণ্টাই মদে ডুবে আছি, তাই ছবি হাতে নিয়ে সে ছবি শেষ করার মতো ধৈর্য বা ক্ষমতা আমার নেই। হাসিও পায়, লজ্জাও করে। আমার বিরুদ্ধে যাঁরা অভিযোগ করেন, আর যাঁরা সে-অভিযোগ সত্যি বলে মেনে নেন, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁদের সঙ্গে আমার তফাতটা হচ্ছে— আমি খোলাখুলি ভাবে চলি, আর তাঁরা চরিত্র-বান পুরুষ, তাই তাঁদের সব কিছুই অপ্রকাশ্য। তা ছাড়া সাধারণ দর্শকের রুচি বা চাহিদা অনুযায়ী ছবি করার লোক আমি নই। অর্থাৎ অর্থনৈতিক সাফল্যলাভের ফর্মুলামাফিক ছবি আমি করতে অক্ষম— এ অভিযোগটাই বেশি শোনা যায়।

এটা ঠিকই যে সরকারি ভাবে কখনও আমার কোন ছবি যায়নি। আর আসল কথা হচ্ছে যে 'সুবর্ণরেখা'র period পর্যন্ত আমি ব্রাত্য ছিলাম, আমি অপাঙ্‌ক্তেয় ছিলাম। সেটা রাজনৈতিক কারণে তো বটেই। তা ছাড়া ভেতরে-ভেতরে সব হিংসার ব্যাপার-ট্যাপার থাকে। এখন আমি জাতে উঠেছি। তখন তো আমি ছিলাম না এমন। কাজেই এখান থেকে, ওখান থেকে নানা রকম খোঁচাখুঁচি, অমুক-তমুক।. . . 'সুবর্ণরেখা' তারা আটকাতে পারেনি। তখন India-তে ভালো subtitle হত না। কোন ছবি বিদেশে পাঠাতে গেলে subtitle না-করে পাঠানো ঠিক নয়। You cannot expect তারা ভেনিস কিংবা কান-এ বসে বাংলা বুঝবে।

(ছবি তৈরির) বাধা প্রধানত আমার স্বাধীনচিত্ততা। আমি কোন দিন মাথা নিচু করতে চাইনি এবং কোন দিন চাইব না। এটা স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবসায়ীদের কাছে অসুবিধাজনক। ফলে এই ঘটনাটা ঘটেছে।

(Individualistic?) আমি? আমার কখনও এ প্রশ্ন মনে হয়নি। আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত individualistic. আমার individualism, ওটা একটা ঘটনা। কিন্তু সেটা কারও বিরুদ্ধে যাওয়ার কথা না। আমি continuously individualistic! তাতে কী হয়েছে? মিঞাজান, হইসে কী তাতে? Life is like that. আমি অনেক গণ্ডগোল করেছি, কিন্তু আমি কারও কখনও ক্ষতি করি নাই। বুঝছেন নি মিঞা?

এই ভালোবাসাকে কবর দিতে পারলাম না বলেই আবার ছবি করছি। নইলে ছবি বোঝে ক'ব্যাটা! বেশির ভাগই তো ড্যাবড্যাব করে দেখে, সব

ছবি ড্যাবড্যাব করে দেখলেই কী হয়! সূক্ষ্ম বোধযুক্ত মন নিয়ে দেখবার, সে রকম তৈরি হওয়া সমঝদার দর্শক চাই। আর সেই তৈরি-দর্শকের অভাব যেদিন পূরণ হবে সে দিন কি ঋত্বিক ঘটক নামক এই মিঞা থাকবে?

(যে-সমস্ত ছবি করেছি, সে সম্পর্কে ভালো বা খারাপ লাগার কথা বলা) খুবই difficult. লোকে ছবি যখন করে তখন খুব ভালো না-লাগলে করে না, অন্তত আমি করি না। মানে subject-টা, যেটা নিয়ে আমি ভাবছি, সেটা ভালো না-লাগলে কী ভাবে ছবি করা সম্ভব?

ছবি করার একটা অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের দিক আছে, inhuman labour-এর একটা ব্যাপার। খাটুনি মানে সাংঘাতিক খাটুনি। আর্থিক দিক তো আছেই। অর্থ সংগ্রহ করলাম এত কষ্ট করে, তার পর উন্মাদের মতো খেটে একটা ছবি করলাম। সেই ছবির subject যদি না আমার পছন্দ হয়, যদি আমার তা ভালো না-লাগে, তা হলে কি কোন কিছু করার প্রেরণা পাওয়া যায়? যায় না।

মানুষে খাটে, মানে এ রকম খাটুনি, creative খাটুনি আর কী, ভালো লাগে বলেই খাটে। শুধু পয়সা পাবে বা নাম হবে বলে খাটে, আমার তা মনে হয় না। Naturally বুঝতে পারছেন আমি তাঁদের কথা বলছি না, মানে বেশির ভাগ মানুষের কথা বলছি না। মুষ্টিমেয় যাঁরা ছবিটাকে গভীর ভাবে নিয়েছেন, তাঁদের কথাই বলছি।

সমস্ত ব্যাপারটা মায়ের জন্ম দেওয়ার মতো ব্যাপার। কী ভাবে সৃষ্টি পরিণতি লাভ করে, তার কোন হিশেব নেই। সব কিছুই ভালোবাসা থেকে জন্ম নেয়। ভালোবাসি, তা-ই ছবি করি। এর মধ্যে ভাগ করতে গেলে, রীতি বা পদ্ধতির সন্ধান করতে গেলে আমি কূলকিনারা হারিয়ে ফেলি। আমার মনে হয় যাঁরা ভালো ছবি করেন, তাঁরা এর বাইরে যেতে পারেন না।

আমার ছবি করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে ভালো-লাগা এবং. . . এগুলো বহু বার ঘটেছে, ভাই। ওটা নিয়ে কথা বলে লাভ নেই, কারণ কাজকম্ম করতে গেলে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়। তা আমি কী বলব? ওটা আমার আশেপাশে যারা ছিল তারা বলবে। কথা হচ্ছে যে মোটামুটি ভাবে— এক কথায়— আমি বেঁচে গেছি। (চিৎকার করে) বেঁচে গেছি।

ভালো না-লাগলে ছবি কী করে করে মানুষ?. . . 'সুবর্ণরেখা' পর্যন্ত সব ছবি

করেই আমি আনন্দ পেয়েছি, ভীষণ ভালো লেগেছে। কোন্ ছবি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে আর কোন্ ছবি খারাপ লাগে, দয়া করে ও-রকম মামুলি প্রশ্ন করবেন না, কেননা ঐ প্রশ্নের উত্তর পরিচালক যা দেবে তাতে ভুল হবার সম্ভাবনাই বেশি।

দশ বছর ধরে আমি পানাসক্ত। এইটা আমায় শিল্পকর্মে মদত দেয় যথেষ্ট— এ কথা বলবই। কিন্তু খুবই বিপজ্জনক ও বেদনাদায়ক। এক সময় আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতাম। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পর থেকে এটি আরম্ভ করে আমি যা বিপদে পড়েছি, তার কোন সীমাসংখ্যা নেই। প্রতি মুহূর্তে ভাবি যে একে বিদেয় করব। কিন্তু দেহের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে ছাড়তে গেলে সোজাসুজি মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে। এক কথায় বলতে গেলে এই কথাই বলতে হয়।

আর, মানুষকে ভালোবাসি আমি পাগলের মতো। মানুষের জন্যেই সব কিছু। মানুষই শেষ কথা। সব শিল্পেরই শেষ পর্যায়ে মানুষে পৌঁছতে হয়। যাঁরা তা করেন না, তাঁরা শিল্পী বলে আমার কাছে কোন আদর পাবেন না।

ঈশ্বরে আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। শুধু তা-ই নয়, এ নামটাকেই আমি ঘৃণা করি। এই সব গল্প দিয়ে আর কত দিন সমাজ-সংসার চালাতে হবে, সেটা আমাকে বুঝতে হবে। এ সব বানানো গপ্পো সম্পূর্ণ জোচ্চুরি। আর, বেবাক জোচ্চুরি দিয়ে খুব বেশি দিন ঠকানো বা ঠেকিয়ে রাখা যায় না, এটাও ভাববার সময় এসেছে।

ছবি করি? এই মোটামুটি পাগল বলে তা-ই। ছবি না-করে তো বাঁচতে পারি না। একটা কিছু করতে হবে তো? কাজেই এই ছবি করি, আর কিছু না।

(ছবি করার সময়ে নজর রাখি) মানুষের দিকে। তাৎক্ষণিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কোন্ দিকে যাচ্ছে সেটার দিকে তাকাই। এবং to the best of my ability আমি সেটাকে বলার চেষ্টা করি। আমার একমাত্র চিন্তার বিষয় হচ্ছে আমার দেশের মানুষ। আমার আর কিস্যু নেই। সে, দেশের মানুষ আমাকে গ্রহণ করুক কী বর্জন করুক, যায় আসে না। কিন্তু আমার একমাত্র ঘটনা হচ্ছে আমার মানুষ। আর কিছু কি আছে?

ছবি তৈরির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের ভালো করা। মানুষকে ভালো না-করতে পারলে কোন শিল্পই শিল্প হয়ে দাঁড়ায় না। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন যে শিল্পকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে, তারপর সৌন্দর্যনিষ্ঠ। এই সত্য মানুষের নিজস্ব ধ্যানধারণা থেকে আসে। কারণ সত্য কোন সময়েই শাশ্বত নয়। এই

পৃথিবী সব সময়ে অপেক্ষমান। প্রত্যেককে নিজস্ব সত্য জীবনের গভীরতা দিয়ে অর্জন করতে হয়। এটা অনুভব করে গ্রহণ করা উচিত। শিল্প এত সহজ জিনিশ নয়।

আনন্দ না-করলে তো শিল্পসৃষ্টি হয় না!. . . দ্বিতীয় কথা যে মানুষের ভালো করা— এটাকে তো ছেড়ে কাজকর্ম করা যায় না। মানুষকে না-ভালোবেসে তুমি কি করে কাজ করবে? কাজ করতে হলে মানুষকে পাগলের মতো ভালোবাসতে হবে। হ্যাঁ, সেটা আর-একটা দিক। এ দুটোর মধ্যে কোন গণ্ডগোল নেই। শিল্পসৃষ্টি করতে গিয়ে আমি ভালোবাসুম না ক্যান? (মানে) at the same time why don't I love you? কাজেই এই দুটোর মধ্যে কোন inherent contradiction নেই।

মানুষের জন্যে ছবি করি। মানুষ ছাড়া আর কিছু নেই। সর্ব শিল্পের শেষ কথা হচ্ছে মানুষ। আমি আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় সেই মানুষকে ধরবার চেষ্টা করি।

ফিল্ম একটা নতুন কিছু না। সর্ব শিল্পে যেমন, তেমনই ফিল্মেও কত-গুলো গভীরতম ঘটনা খুঁজে বের করতে হয়। আমি মনে করি, ছবি একটা শিল্প, এবং যখন শিল্প, তাকে দায়ী হতে হবেই । দায়িত্ব মানবের প্রতি। এ কথাটা ভুললে চলবে না।

বর্তমানে ব্যক্তিজীবন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। এখন সমাজজীবনটা অনেক বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে। কাজেই শিল্পের অনুষঙ্গ থাকা উচিত মানবজীবনের সঙ্গে, সমাজজীবনের সঙ্গে। একটা ভালো-লাগার প্রশ্ন আছে, যেটা না-থাকলে শিল্পী হারিয়ে যায়। আমার মনে হয়, সেটা শিল্পের একটা বিকৃত রূপ। এই কথাটা মনে রাখলে আগেকার কথাগুলো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

(Film form-এর) কোন পৃথক্ গুণ নেই। মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং তাকে সম্মোহিত করার যে-ঘটনা, সেটা সব শিল্পেই সমান। ফিল্ম সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করে কোন মূল্য দেওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। মানুষ মানুষই। তাদের স্নেহ একই ধারায় বর্ষিত হয় সর্বশিল্পে। এখানে ফিল্মকে বড় করে তুলে ধরার কোন মানে আমি বুঝতে পারি না। এর বেশি আমার আর কিছু বলার নেই।

ছবি তো নিশ্চয়ই করতে হবে, ছবি না করলে খাব কী? তিন-চার মাসের মতো একটা অবস্থা হবে, এ দুটো ছবি release করলে। তারপর পেটের দায়ে আবার আসব কাজের চেষ্টায়। Ultimately money matters, nothing else

matters. আমরা কাগজ-কলমের ব্যাপারেতে নেই— বিদেশি পরিচালকের কথা যে কাগজ-কলমের মতো শস্তা (যখন হবে)— ও-সব ফাজলামির কথাবার্তা বলে তো কোন লাভ নেই। আমার বাংলা ছবি করতে গেলে আড়াই লাখ খরচ হয়— হিন্দি ছবি করতে গেলে ৫ লাখ টাকা minimum. আমার পাঁচটা পয়সা নেই পকেটে, শালা, একটা বিড়ি খাওয়ার পয়সা নেই, তা আমি কোত্থেকে টাকা পাব। কাজেই পয়সা, অর্থ, এ সব লাগে। এগুলো avoid করে ও-সব পাকামি করে (লাভ নেই)। কাগজ-কলমের ব্যাপার নয়, ১-২ টাকা invest করলেই হয়ে গেল।

মনে আমি খুব সুস্থ। আমি মনের দিক দিয়ে সুস্থ আছি, স্ফূর্তিতে আছি, দেহের দিক থেকেও মোটামুটি ভাবে সুস্থ আছি। এরা অনেকখানি আমাকে সারিয়ে তুলেছে।

আমাদের পরিচালকদের সোজা ফুটপাথে নেমে আসতে হবে। বাংলাদেশ বর্তমানে একটা কঠিন ডামাডোলের মধ্য দিয়ে চলেছে। এখন আমাদের মানুষের সঙ্গী হতে হবে। যা কিছু করণীয়, তা মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করতে হবে। শুধু অর্থের কথা চিন্তা করলে চলবে না। এ ভাবেই সার্থক ছবি তৈরি হবে।

সার্থক পরিচালক হতে হলে কবির মতো তার ছন্দোময় এক স্বপ্নভরা চোখ থাকা দরকার। এর বাইরে তিনি সম্পূর্ণ সাধারণ মানুষ।

Career! কেরিয়ার! কার career? কীসের career? সমস্ত দেশটাই খাপরিখানা হয়ে গেল— career-টেরিয়ার ও-সব ভাঁওতাবাজির কথা।

বেদনা ও অন্ধকার সবার জীবনেই আসে। কিন্তু তা-ই নিয়ে যাঁরা হারিয়ে যান, তাঁদের মেরুদণ্ড নেই বলেই আমি মনে করি। আমার জীবনেও এ সব এসেছে। কিন্তু আজও পর্যন্ত আমি মাথা উঁচু করে আছি। সেগুলি সম্পর্কে ইনিয়ে-বিনিয়ে গল্প বলার কোন অবকাশ নেই বলেই আমি মনে করি। দুঃখ-দুর্দশা না-হলে মানুষ কখনও শিল্পী হতে পারে না। আমি যা কিছু দুঃখ পেয়েছি, তার দ্বারা কিঞ্চিৎ মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছি— অবশ্য যদি আমাকে মানুষ বলে আপনাদের মানুষকুল ভাবেন। দুঃখকে ভালোবাসতেই হবে। তারই মধ্যে নিহিত রয়েছে পরম প্রাণ, যেটাকে খুঁজে বার করার মতো মনুষ্যত্ব থাকার অবশ্যই দরকার বলে আমি মনে করি।

(ঋত্বিক এখন শেষ?) লোকে যখন বলে থাকে, তখন ঘটনাটা সর্বাংশে না-হলেও বহুলাংশে সত্য। আমার ছবি আরম্ভ করা এবং না-করার কারণ বোধ হয় বহুবিধ। প্রথমত আমার বদমায়েশি। কেন জানি না কাজ আরম্ভ করে ফাজলামি করার একটা ইচ্ছে জাগরুক হয়। এ যেন সেই রবি ঠাকুরের ছেলেটির বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, 'দেখিই না কী হয়'-ধাঁচের একটা মনোভাব আর কী!

নিজের এবং আশপাশের লোকদের বারোটা বাজিয়ে কতখানি মজা পাওয়া যায়, তা দেখা। দ্বিতীয়ত, আমার বিচিত্র মদ্যপ্রিয়তা। কেন জানি না আমার কাছে মনে হয় সর্বমার্গের শেষ মার্গ হচ্ছে মদ। বেড়ে জমে, অন্তত আমার কাছে।

তৃতীয়ত, এই ফিল্মের ব্যবসাদার জাতটা আদ্যন্ত শুয়োরের বাচ্চায় ভর্তি। এদের আগাপাছতলা শঙ্কর মাছের চাবুক দিয়ে লোহিতবর্ণ করতে পারলে কিছু একটা কাজের কাজ হত। এই ব্যক্তিরা পরের ছিদ্রান্বেষী, এঁরা পরের ক্ষতি করতে পেরে যে-তুরীয় আনন্দ উপভোগ করেন, তা কেবল সপ্তম স্বর্গেই সম্ভবপর। সোজা কথা সহজ ভাবে শোনা ও বলার ক্ষমতা, সৎ সাহস বোধ হয় এই সব প্রায়-মানবদের নেই।

প্রধানত, আমি বোধ হয় ছবির জগতে কোন দিন জোচ্চুরি করিনি, জীবনে বহু করেছি। ওটা মনে হয় এ বাজারে জমে না, উলটোটা জমে।

আমি ছোটবেলা থেকেই অস্থিরমতি। কোন একটা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকব, সে আমার কপালে লেখা নেই। তাই বাঁধাধরা চাকরি যখনই করতে গেছি তখনই কিছু দিনের ভেতর হাঁপিয়ে উঠেছি। মুক্তি চেয়েছি, মুক্তি পেতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। প্রচুর ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছি নানা ভাবে। তবুও সেই সর্বনাশা উপগ্রহের হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। কিছুতেই পারলাম না নিজেকে একটা বাঁধাধরা চলতি পথের যাত্রী করতে। লোকে বলে আমার চরিত্রের নাকি সেটাই প্রধান দোষ। এটা কাটিয়ে উঠতে পারলে নাকি বিরাট কিছু করবার সম্ভাবনা এখনও আমার আছে।

বাঁচব কী নিয়ে? চারদিকে শুধু হতাশা, বিদ্বেষ, প্রতারণা, বঞ্চনা। যে-প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে মহান সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলাম, তাঁরা যে শুধু আমাকে নিরাশই করেছেন তা-ই নয়, তাঁরা আজ শত্রুতাও করছেন।

আমি জানি আমার দোষগুণের কথা। আমি জানি আমার অপবাদের কথা। তবুও একটা কথা আজ আপনাকে জানিয়ে রাখি। আমি আজও মরে যাইনি, আমি আজও হার স্বীকার করিনি। আমি নীরবে সে সুযোগের

অপেক্ষায় আছি। আজ না-পারি কাল, কাল না-পারি পরশু— আমি প্রমাণ করে দেব আজও আমি সংগ্রামী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখি। তাদের আমি ভুলে যাইনি। অভাব-অনটন-অপবাদ কিছুই আমাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবে না, তার জন্য যে-মূল্য দিতে হয়, আমি দিতে প্রস্তুত। মরবার আগে আমি প্রমাণ করে দিয়ে যাব আমার চারপাশের জনতার চাইতে আমি অন্য রকম।

সত্যজিৎ রায়

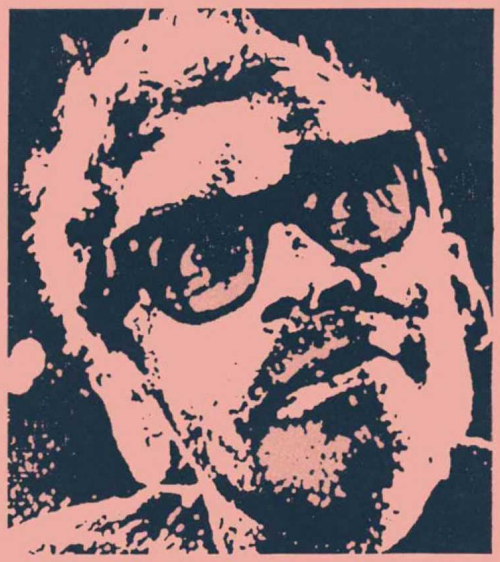

'ছবি করার একটা অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রমের দিক আছে, inhuman labour-এর একটা ব্যাপার। খাটুনি মানে সাংঘাতিক খাটুনি। আর্থিক দিক তো আছেই. . . তার পর উন্মাদের মতো খেটে একটা ছবি করলাম। সেই ছবির subject যদি না আমার পছন্দ হয়, যদি আমার তা ভালো না-লাগে, তা হলে কি কোন কিছু করার প্রেরণা পাওয়া যায়? যায় না।

মানুষে খাটে, মানে এ রকম খাটুনি, creative খাটুনি আর কী, ভালো লাগে বলেই খাটে। শুধু পয়সা পাবে বা নাম হবে বলে খাটে, আমার তা মনে হয় না।. . .
বেশির ভাগ মানুষের কথা বলছি না। মুষ্টিমেয় যাঁরা ছবিটাকে গভীর ভাবে নিয়েছেন, তাঁদের কথাই বলছি।

সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা ও মনফকিরা
১০০ টাকা